শিখর পেরিয়ে

বি. এম. পাবলিশার্স ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

মণিকে

শিখর পেরিয়ে

বিশাল লিভিং রুমটার মাঝখানে দামি কার্পেটের ওপর অনেকগুলো সোফা, সেন্টার টেবল আর সাইড টেবল নিপুণভাবে সাজানো। সেখানে পরস্পরের কাছাকাছি বসে আছে তনিমা আর দেবনাথ।

সোফা টোফা ছাড়াও চারদিকে রয়েছে টিভি, টেলিফোন, কাচের পাল্লা দিয়ে ঘেরা ক্যাবিনেটে অজস্র ক্যাসেট। একটা দেওয়ালে আইভরির বাঁটওলা একজোড়া নেপালি কুকরি আড়াআড়ি আটকানো। আছে পেতলের টবে নানা আকৃতির ক্যাকটাস, অ্যাকোয়ারিয়াম, দুর্লভ কিউরিও, দু'টো এয়ার-কুলার। এয়ার-কুলার অবশ্য এখন চালু নেই।

লিভিং রুমের দুই দেওয়ালে তনিমার নানা পোজের চোখধাঁধানো মাল্টি-কালার পোস্টার সাঁটা। সে বাংলা সিনেমার নাম-করা তারকা। পাঁচ বছর আগেও তার নামের আগে বসানো হত মহানায়িকা বা গ্ল্যামার কুইন। এই পোস্টারগুলো সেই সময়ের। তা ছাড়া আছে তুখোড় ফোটোগ্রাফারদের দিয়ে তোলানো তার কত যে ক্লোজ-আপ। কোনওটা সামনে থেকে তোলা। কোনওটা পাশ থেকে। কোনওটা কোনাকুনি। সিনেমার পোস্টারই হোক বা তোলানো ছবিই হোক, সেগুলো থেকে ঝাঁঝ যেন ঠিকরে বেরোয়।

রাস্তার দিকের দেওয়ালের পুরোটা জুড়ে কাচের জানালা। এখন সেগুলো খোলা।

আঠারোশো স্কোয়ার ফিটের এই অ্যাপার্টমেন্টের তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে লিভিং রুম। বাকিটায় চারটে বেড-রুম, কিচেন, স্টোর, সাজসজ্জার জন্য আলাদা জায়গা, ইত্যাদি।

তনিমাদের এই হাই-রাইজটা ঠিক মেইন রাস্তার ওপরে নয়। সেখান থেকে কংক্রিটের একটা পথ ভেতর দিকে সামান্য ঢুকে এসেছে। বাড়িটা তার শেষ মাথায়। এলাকাটা নিরিবিলি। সবরকম ঝামেলা থেকে মুক্ত।

মার্চের শুরু। ফেব্রুয়ারির মাঝমাঝি থেকে শীতের দাপট দ্রুত কমে আসছিল। এখন বাতাস বইছে ফুরফুরে মেজাজে, মাঝে মাঝে দমকা ঘূর্ণি তুলে। নিচের সরু পথটায় লাইন দিয়ে প্রচুর পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া। এখনও ফুল ফোটেনি। না ফুটুক, তবু কলকাতায় বসন্ত হাজির হয়ে গেছে।

এখনকার তনিমার দিকে তাকালে দেওয়ালের ছবিগুলো পুরনো দিনের সুখস্মৃতি মনে হবে। সে নিজেও জানে, শরীরের সেলগুলোতে চোরা বানের মতো ঢুকে যাচ্ছে বয়স। সূর্য আর মধ্য গগনে নেই, ঢলে পড়েছে অনেকটাই। গনগনে আঁচ জুড়িয়ে আসছে। তবু তনিমার চোখে মুখে, ভরাট বুকে, মসৃণ গ্রীবায় যেটুকু আছে, মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। তার পরনে এই মুহূর্তে টাইট জিনস, ওপরে ঢোল্লা শার্ট।

তনিমার সামনে যে বসে আছে, অর্থাৎ দেবনাথ, তার বয়স পঞ্চাশের ধারেকাছে। ছ'ফিটের মতো হাইট, চওড়া কাঁধ, ঠাসা মাংসল চেহারা, হাত-পায়ের হাড় চওড়া, চৌকোমতো মুখ, ছড়ানো চোয়াল, চোখের তারা দু'টো বাদামি। পরনে লম্বা লম্বা ডোরাওলা ঢিলেঢালা পাজামা আর ড্রেসিং গাউন। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, দেবনাথের মধ্যে লুকোনো রয়েছে হিংস্র বুনো কোনও জানোয়ার, যখন তখন সেটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। সে তনিমার কম্পানিয়ান। সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী। এমনকি নৈশ শয্যাতেও।

তনিমা পিঠটা আলগাভাবে সোফায় এলিয়ে দেয়। ওধারের খোলা জানালাগুলো দিয়ে দূরে মেইন রোডের দিকে তাকায়। স্রোতের মতো ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, বাস, মিনিবাস ছুটে যাচ্ছে। এগারো তলা অর্থাৎ দেড়শো ফিট উচ্চতা থেকে খেলনাগাড়ি মনে হয়। লোকজনও যা চোখে পড়ছে, সব যেন বামনের সারি।

বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর আড়ালে কখন নেমে গেছে, কে জানে। আকাশের গায়ে শেষ বেলার ফিকে আলো। হিমঋতুর পর থেকে দিন বড় হচ্ছে। সন্ধে নামতে এখনও বেশ খানিকটা দেরি।

বাইরে চোখ রেখে তনিমা জিজ্ঞেস করে, 'কই তোমার পার্টির কী হল? তাদের তো পাত্তাই নেই—'

সেন্টার টেবলে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার পড়ে ছিল। তুলে নিয়ে একটা ধরাল দেবনাথ। সামনের ওয়াল-ক্লকটা এক পলক দেখে বলল, 'সাড়ে পাঁচটায় আসার কথা। এখনও আট মিনিট হাতে আছে। ঠিক এসে পড়বে।'

তনিমা উত্তর দিল না। যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। ভেতরে ভেতরে চাপা অস্বস্তি বোধ করছিল সে।

দেবনাথ সিগারেটে টান দিয়ে এবার বলল, 'আমাদের চেয়ে ওদের গরজ কম না। বরং ফাইভ টাইমস বেশি। না এসে যাবে কোথায়?'

তনিমা ঢোক গিলে বলল, 'তুমি হুট করে এমন একটা কাণ্ড করে বসলে! আমার ভীষণ নার্ভাস লাগছে।'

দেবনাথ সহজে মাথা গরম করে না। বিরক্ত হয় না। ধৈর্য তার অপরিসীম। মেজাজটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল তার আয়ত্তে। বিশেষ করে তনিমার ব্যাপারে। কিন্তু খেপে গেলে অন্য মূর্তি। তখন সে চিতাভাঘ। ধীরে ধীরে মুখ থকে ধোঁয়ার বৃত্ত বার করে খুব শান্ত গলায় বলল, 'তোমাকে জিজ্ঞেস না করে কিন্তু কিছু করিনি।'

'জিজ্ঞেস করেছ। সেই সঙ্গে জোরও কবেছ।'

'তা করেছি। কারণ এতে ভালো হবে।'

'কী ভালো যে হবে, মাথায় ঢুকছে না।' তনিমা সামান্য অসহিষ্ণু। সেটা খুব সম্ভব মানসিক চাপের কারণে। বলতে লাগল, 'পলিটিকসের 'প'-ও আমি বুঝি না।'

'বুঝে যাবে।'

একটু চুপ।

তারপর দেবনাথ কণ্ঠস্বর একটুও ওপরে না তুলে বলল, 'আজ অব্দি আমার কথামতো যা যা করেছ, তাতে কি তোমার এতটুকু ক্ষতি হয়েছে?'

তনিমা মুখ ফিরিয়ে তার সঙ্গীটিকে একবার দেখে নিল। এই লোকটা বছর দশেক তাকে আগলে আগলে রাখছে। স্বীকার করতেই হবে, তার ছক অনুযায়ী চলে সে লাভবানই হয়েছে। আস্তে মাথা নাড়ে তনিমা, 'না—'

গলাটা গাঢ় করল দেবনাথ, 'ফিউচারে কত যে গেইন করবে, এখন ভাবতেই পারছে না।'

একটা বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচনে নামার জন্য তনিমাকে টিকেট দিতে চাইছে। অফারটা আসামাত্র হামড়ে পড়েছিল দেবনাথ। তনিমা আদৌ রাজি ছিল না। প্রচণ্ড চাপাচাপি করে দেবনাথ তার মত আদায় করে ছেড়েছে। কিন্তু সংশয় একেবারেই কাটছে না। আজ পার্টির এক নেতা সবান্ধবে এসে কী সব কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে যাবেন। মিউজিক্যাল ওয়াল-ক্লকটার কাঁটা যতই সাড়ে পাঁচটার দিকে এগুচ্ছে, তনিমার অস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ছে, বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারই মধ্যে দেবনাথের শেষ কথাটায় অবাক হল, 'কী গেইন?'

একটা চোখ ছোট করে দেবনাথ বলল, 'তুমি কি এমনই কচি শিশু যে শুয়ে শুয়ে ফিডিং বটলে দুধ খাও?'

'মানে?'

'আজকালকার বাচ্চারও জানে পলিটিকসে মধু আছে।'

'কিসের মধু?'

চোখ টিপল দেবনাথ। 'যতই গ্ল্যামার কুইন হও, ভেতরে ভেতরে এখনও আটাগুড়ির গাঁইয়া মেয়েটাই রয়ে গেলে।' বলে বাঁ হাতের দুই আঙুলে টাকা বাজাবার মুদ্রা ফুটিয়ে তুলল, 'এথী খুকুমণি—এথী—'

তনিমা কী বলতে যাচ্ছিল, ফোন বেজে ওঠে।

দেবনাথের সোফাটার পাশে একটা নিচু স্ট্যান্ডে টেলিফোন রাখার ব্যবস্থা। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে কিছু শুনে নিয়ে সে বলল, 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও—' ফোনটা জায়গামতো নামিয়ে রাখতে রাখতে তনিমাকে বলে, 'ওরা এসে গেছে।'

এ বাড়িতে নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা। কারও ভিজিটর এলে সিকিউরিটির লোকেরা আগে ফোন করে জেনে নেয়, পাঠাবে কি না। ফ্ল্যাটের মালিক বললে তবেই পাঠায়।

বাইরে আলো থাকলেও লিভিং রুমের ভেতরটা আবছা আঁধারে ভরে গেছে। একটা কাজের লোক এসে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল।

তনিমা টের পেল, তার পেশিগুলো কেমন যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। এয়ার-কুলার না চালালেও মার্চের এই বিকেলে লিভিং রুমটা বেশ স্নিগ্ধ, তবু কপালে মিহি ঘাম ফুটতে শুরু করেছে তার।

দেবনাথ লক্ষ রাখছিল। তনিমার কাঁধে আলতো করে হাতের চাপ দিয়ে আশ্বাসের সুরে বলল, 'নো টেনশন ডার্লিং। আমি তো আছি—'

তনিমা সামান্য হাসল মাত্র। কতটা ভরসা পেল, নিজেই জানে না।

দেবনাথ বলতে থাকে, 'ওরা এলে তুমি বেশি কথা বোলো না। যা বলার আমিই বলব। তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে মাপা উত্তর দেবে। ও.কে?'

বাধ্য মেয়ের মতো মাথা কাত করল তনিমা।

ডোর-বেল বেজে ওঠে। তনিমার তিনটি কাজের লোক। একজন রান্না করে, আরেক জনের ডিউটি বাজার করা থেকে ব্যাংকে দৌড়নো, টেলিফোনের বিল, ইলেকট্রিসিটির বিল, কর্পোরেশনের ট্যাক্স জমা দেওয়া, ইত্যাদি। তিন নম্বর লোকটি কাপড় কাচে, বাসন মাজে, ঘর সাফ করে।

দেবনাথ কাজের লোকদের কাউকে পাঠাল না।

এক হ্যাঁচকায় সোফা থেকে নিজেকে টেনে তুলে দ্রুত পায়ে লিভিং রুমের শেষ মাথায় গিয়ে দরজা খুলে দিল। বাইরে তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখ জুড়ে তেলতেলে হাসি ফুটে ওঠে দেবনাথের। হাতজোড় করে বলে, 'আসুন—আসুন। আপনাদের জন্যেই আমরা ওয়েট করছি।'

এদিকে তনিমা উঠে দাঁড়িয়েছিল। দেবনাথ তিন আগন্তুককে নিয়ে ফিরে এল। একজনের বয়স ষাটের কাছাকাছি। বেশ সুপুরুষ। মজবুত স্বাস্থ্য। চওড়া কপাল। কাঁচাপাকা প্রচুর চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখে ভারী ফ্রেমের বাই-ফোকাল চশমা। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে দামি চপ্পল। খুবই পরিচিত মুখ। টিভি'র পর্দায় বা খবরের কাগজে এঁকে অনেক বার দেখেছে তনিমা। নামটাও জানা—সুবিমল রাহা। বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা।

দ্বিতীয় লোকটিকেও চেনে তনিমা। টিভি এবং কাগজে এঁর ছবিও চোখে পড়েছে তার। নাম কৃষ্ণকিশোর তরফদার। ইনিও একজন নেতা। দেখে মনে হয়, পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। মাঝারি হাইট। গোলগাল, নাড়ুগোপাল-মার্কা চেহারা। মাথাজোড়া চকচকে টাক। চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা। ধবধবে গায়ের রং। চামড়া এত টান টান আর মসৃণ যে মাছি বসলে পিছলে যাবে। এঁরও পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। পায়ে অবশ্য পাম্প শু।

দুই নেতার সঙ্গে যে এসেছে সে একেবারেই অচেনা। বয়সও যথেষ্ট কম। তিরিশের ঘরে। পাতলা, রোগাটে চেহারা। তবে দেখতে ভালোই। ছ'ফিটের ওপর হাইট। তার পরনে শার্ট আর ফুলপ্যান্ট। নেতাদের সহচর যখন, নিশ্চয়ই ফ্যালনা কেউ নয়।

হাতজোড় করে তনিমা বলল, 'বসুন—'

প্রতি-নমস্কার করে তিনজন বসার পর তনিমাও বসল। আপ্যায়নের বন্দোবস্ত আগেই করে রাখা ছিল। দেবনাথ ব্যস্তভাবে ভেতরে গিয়ে কাজের লোকেদের চা'টা দিয়ে যাবার ফরমাশ করে ফিরে এসে তনিমার পাশে বসতে বসতে বলল, 'আগে পরিচয় করিয়ে দিই—'

তনিমা বলে, 'দরকার নেই।' কৃষ্ণকিশোর আর সুবিমলকে দেখিয়ে বলল, 'ওঁদের মুখ আমার চেনা। ওঁরাও আশা করি, আমাকে চেনেন।'

দেবনাথ বলল, 'তবু ফর্মালিটির একটা ব্যাপার তো থাকেই।'

আনুষ্ঠানিক পরিচয়পর্ব চুকল। সেই অচেনা তরুণটির নাম জানা গেল—পরিমল দত্ত। সুবিমলদের ইউথ উইঙের সেক্রেটারি। দলের গুরুত্বপূর্ণ যুব-নেতা।

গোড়ার দিকে মামুলি কিছু কথাবার্তা হল।

সুবিমল বললেন, 'আপনাকে এতদিন সিনেমার পর্দায় দেখেছি। সামানাসামনি দেখার সৌভাগ্য এই প্রথম হল।'

তনিমা লক্ষ করে, এই বয়সে চশমার পুরু লেন্সের আড়ালে সুবিমলের সেই চোখ ঝকঝক করছে। চকিতে তার নজর অন্য দু'জনের দিকে চলে যায়। তাঁরাও

তার দিকে তাকিয়ে আছেন। পলকহীন। তনিমা জানে, তাকে দেখলে মানুষ একেবারে হামলে পড়ে। পুরুষ বা মহিলার বাছবিচার নেই। সবাই তার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তার গা ঘেঁষে দাঁড়াতে চায়, তার গায়ে হাত বুলিয়ে বুঝতে চায় সে রক্তমাংসের মানবী কি না, নাকি মায়াকাননের অলীক কোনও পরী। যুবকদের কথা না হয় বাদই দেওয়া যাক। নারীদেহের জন্য তাদের থাকে তীব্র ছোঁকছোঁকানি, বিশেষ করে সে যদি হয় দুর্লভ রমণী। যে বয়সের যা। সেটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু বুড়োরা আধবুড়োরা? তারা পরকালের বর্ডারে পৌঁছে গেছে, গায়ের চামড়া কুঁচকে মুচকে ঝলঝল করছে, হাঁটুতে জোর নেই, চোখে সাত পুরু ছানি, শরীরের সব কিছুই শিথিল হয়ে গেছে—তনিমাকে দেখলে তারাও চিড়িক মেরে খাড়া হয়ে যায়। ঘোলাটে চোখ জ্বলে ওঠে। বহুকাল আগের ঘুমিয়ে-পড়া কামাতুর চিতা তাদের ঠাণ্ডা রক্তে দাপাদাপি শুরু করে। ঝরতে থাকে অদৃশ্য লালা। নেহাত নখদন্তহীন, দেহ অক্ষম, নইলে এরাও ঝাঁপিয়ে পড়ত।

কিন্তু এ-সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। বলা যায়, এতে মজাই পায় তনিমা। সুবিমলদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে, লজ্জা-লজ্জা ভাব করে সে বলে, 'কী যে বলেন! আপনাদের মতো নেতারা আমার কাছে এসেছেন। সৌভাগ্য তো আমারই।' বলে চোখের কোণ দিয়ে দেবনাথকে দেখে নিল। তনিমা বুঝে নিতে চায়, যে-উত্তরটা জননেতাদের দিয়েছে তা সঠিক হয়েছে কি না। দেবনাথ ডান চোখের ভুরু সামান্য উঁচুতে তুলে ইশারা করল। অর্থাৎ কোনও সমস্যা নেই। তনিমা এভাবে চালিয়ে যেতে পারে।

কৃষ্ণকিশোর মজার গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমাদের দু'পক্ষেরই সৌভাগ্য। এই যে যোগাযোগটা হল, আশা করি তাতে আপনারা আর আমরা, বোথ পার্টিই বেনিফিটেড হব।'

এই অ্যাপার্টমেন্টে আসার আসল উদ্দেশ্যটা কী, সেটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন কৃষ্ণকিশোর। তনিমা জবাব দেয় না। হাসিমুখে বসে থাকে।

সুবিমল বললেন, 'আপনি হয়তো জানেন, পলিটিক্যাল পার্টির লোকজনকে সারাক্ষণ দৌড়ের ওপর থাকতে হয়। আজ এখানে মিটিং, কাল ওখানে কনফারেন্স। এ সপ্তাহে অর্গানাইজেনশনের কাজে পুরুলিয়ায় ছুটছি তো পরের সপ্তাহে জলপাইগুড়ি। আমাদের মতো বড় দলে নানারকম গোষ্ঠী থাকে। গোষ্ঠী মানেই কোন্দল। একে খুশি করা গেল তো, ও খেপে উঠল। তখন তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করো। এর ওপর নানা ইস্যুতে ধরনা আছে, পথ অবরোধ আছে, স্ট্রাইক আছে। অপোনেন্ট পার্টির সঙ্গে ক্ল্যাশ তো লেগেই থাকে। সে-সব

সামলাতে হয়। ঝক্কি কি দু-চারটে? নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত মেলে না। তবু তারই ভেতর সময় করে আপনার বই দেখি। আমি আপনার একজন ভক্ত—'

সুবিমলের কথার সুতো ধরে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'আমাকেও সুবিমলদার মতো সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। একটু যে রিল্যাক্স করব সেই সময়টুকু অব্দি নেই। তবু আপনার বই রিলিজ করলে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে হল-এ দেখতে যাই। কী ভালো যে লাগে আপনার অ্যাক্টিং!' তাঁর চোখে মুখে অপার মুগ্ধতা।

পরিমল তার চোখ দু'টো গোল করে তনিমাকে গিলছিল, আর সমানে ছটফট করছিল। সিনিয়র লিডারদের কথার মাঝখানে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তাই ঠোঁট টিপে বসে থাকতে হয়েছে। কিন্তু এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না। নামতা পড়ার মতো একদমে তনিমার কুড়ি-পঁচিশটা ছবির নাম করে বলে উঠল, 'প্রত্যেকটা ফিল্মেই আপনাকে ফ্যান্টাস্টিক লেগেছে। সোফিয়া লোরেন আর এলিজাবেথ টেলরকে এক সঙ্গে মেশালে যা হয় আপনাকে সেইরকম মনে হচ্ছিল।' যুবনেতার গলা থেকে উচ্ছ্বাস ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল।

তনিমা লক্ষ করেছে, সুবিমল আর কৃষ্ণকিশোর সিনেমাকে 'বই' বলেছেন। পরিমল সে ভুল করেনি। সে বলেছে— ফিল্ম।

ছোকরার প্রশংসাটা বাড়াবাড়ি রকমের। এ-সব ক্ষেত্রে বিনয়ী হতে হয়। তাই হল তনিমা। 'প্লিজ ওঁদের সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। ওঁরা অল-টাইম গ্রেট—'

পরিমলের গলায় উত্তেজনা ফুটল, 'হলিউড, রোম কি লন্ডনে গিয়ে ছবি করলে আপনিও গ্রেট হয়ে যেতেন। আচ্ছা, আপনার নামে কি কোনও ফ্যান-ক্লাব হয়েছে?'

'ও-সব হয় সাউথে। আর মুম্বাইতে। বেঙ্গলে কি হয়?' একটু ভেবে তনিমা বলল,'উত্তমকুমারের নামে দু-চারটে হয়ে থাকতে পারে।'

একটি কাজের লোক ট্রে বোঝাই করে কেক, সন্দেশ, কাজু বাদাম, নানা ধরনের কুকি আর দু'পট ভর্তি চায়ের লিকার, মিল্ক পট, সুগার কিউবের পাত্র, ফিনফিনে টিস্যু পেপারের ছোট ছোট ন্যাপকিন, ইত্যাদি নিয়ে এল।

পবিত্র গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় নেমে পড়ল তনিমা। নিপুণ হাতে প্লেটে প্লেটে কেক টেক সাজিয়ে সবার সমানে রাখতে রাখতে জেনে নিল, কার চায়ে ক'টা সুগার কিউব দেবে। সুবিমল শুধু লিকার নেবেন। বিনা চিনি, বিনা দুধ। তাঁর ব্লাড-সুগার তিনশো'র কাছাকাছি। শর্করা তাঁর কাছে বিষবৎ। কৃষ্ণকিশোরের ব্লাড-সুগারের সমস্যা নেই। তবু বয়স তো হয়েছে। সাবধানের মার নেই। তাঁর চায়ে দুধের সঙ্গে একটাই মাত্র সগার কিউব। পরিমলের যা বয়স তাতে কোনও রকম নিষেধাজ্ঞা

নেই। সে জানিয়ে দেয় তার কাপে তনিমা যত ইচ্ছা সুগার কিউব, যত ইচ্ছা দুধ ঢালতে পারে।

খাবারের ব্যাপারেও সুবিমল ভীষণ সতর্ক। কয়েকটা কাজু বাদাম আর ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট ছাড়া অন্য কিছু ছুঁলেন না। তনিমা এবং দেবনাথের শত উপরোধেও। কৃষ্ণকিশোর নিলেন কড়াপাকের একটা সন্দেশ আর কাজু। পরিমল কেক থেকে গুলাবজামুন কিছুই বাদ দিল না। দেবনাথ আর তনিমা শুধু চা-ই নিল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুবিমল তনিমার চোখে চোখ রাখলেন। 'এবার কাজের ব্যাপারটা সেরে নেওয়া যাক। দেবনাথবাবুর সঙ্গে আগেই ফাইনাল কথা হয়ে গেছে। তিনি জানিয়েও দিয়েছেন আপনি আমাদের পার্টির টিকেটে সামনের পার্লামেন্টারি ইলেকশানে কনটেস্ট করতে রাজি। দেবনাথবাবুর কথাই যথেষ্ট। তবু—'

সুবিমলের চোখ থেকে চোখ সরায় না তনিমা। দেবনাথের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারও জানতে বাকি নেই। গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের তারকারা তলে তলে কে কার সঙ্গে কী করে বেড়াচ্ছে, কে কার সঙ্গে লিভ-টুগেদার করে, গসিপ ম্যাগাজিনগুলো ঢাকে কাঠি দিয়ে এ-সব কেচ্ছা অনবরত রটিয়ে চলেছে। দেবনাথ আর তাকে নিয়ে কত যে মুচমুচে রসালো স্ক্যান্ডাল ছাপা হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। সুবিমল অন্ধও না, বধিরও না। এইসব কেলেঙ্কারির দু-একটা খবর কি তাঁর চোখে পড়েনি? নিজে না পড়লেও কেউ না কেউ কানে নিশ্চয়ই ঢুকিয়ে দিয়েছে। কেচ্ছার হাজারটা পাখনা। সেগুলো বাতাসে উড়তে থাকে। তবে আজকাল লিভ-টুগেদারটা জলভাত হয়ে গেছে। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দেবনাথ বললে তনিমা যে ফেলতে পারবে না সুবিমলরা তা জানেন। সেজন্য প্রথমে তাকেই ধরেছিলেন ওঁরা।

তনিমা বলল, 'তবু কী?'

সুবিমল বললেন, 'ফর্মালি আপনাকে ব্যাপারটা জানানো। সামনাসামনি বসে কথাবার্তা বলা। আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেওয়া। এই আর কি—'

দেবনাথ হাত ঝাঁকিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, 'না, না, ওর আবার কী প্রশ্ন? আপনারা টিকেট দিচ্ছেন। তনিমা ইলেকশানে কনটেস্ট করবে। ব্যস—'

তনিমা তীক্ষ্ণ চোখে একবার দেবনাথের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'আমার কিছু বলার আছে সুবিমলবাবু—'

ভুরু কুঁচকে গেল দেবনাথের। সমস্ত ব্যাপারটা খুব নিপুণভাবে গুছিয়ে এনেছে সে। তার আশঙ্কা, মেয়েমানুষটা উলটোপালটা কিছু বলে তার পুরো পরিকল্পনাটাই

না কাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু এখন আর তনিমাকে থামাবার উপায় নেই। গুম হয়ে বসে থাকতে হয় দেবনাথকে।

সুবিমল আগ্রহের সুরে বলেন, 'কী বলবেন বলুন না—'

'আপনারা আসার আগে দেবনাথের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি রাজনীতির কিচ্ছু বুঝি না, তবু আমার মতো একজন ফিল্ম অ্যাকট্রেসকে এর ভেতর টেনে আনা হচ্ছে কেন? আপনাদেরও সেই প্রশ্নটাই করছি।'

চকিতে কৃষ্ণকিশোর আর পরিমলকে দেখে নিয়ে সুবিমল বললেন, 'দেখুন ম্যাডাম, সব প্রোফেশনের মানুষ এখন পলিটিকসে আসছে। ডাক্তার, ল'ইয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকউন্টটেন্ট, প্রোফেসর, এমনকি রিটায়ার্ড আই এ এস, আই এফ এস অফিসাররা অব্দি। তা হলে ফিল্মস্টাররা আসবেন না কেন?'

কৃষ্ণকিশোর পাশ থেকে বলে ওঠেন, 'ফ্লিমস্টাররা সোসাইটির একটা খুব ইমপর্টান্ট অংশ। শুধু সিনেমার পর্দায় না, দেশের পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে তাঁদের বড় রকমের রোল প্লে করা উচিত।'

দেবনাথ নড়েচড়ে বসে। উদ্দীপ্ত মুখে বলে, 'স্যার, এটাই আপনারা ওকে ভালো করে বোঝান। ইলেকশানে নামতে রাজি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই তনিমার খুঁতখুঁতুনিটা যাচ্ছে না।'

তনিমা দেবনাথের দিকে ফিরেও তাকায় না। সে কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কৃষ্ণকিশোর ফের বলেন, 'তামিল তেলুগু আর হিন্দি ফিল্মের কত বিরাট বিরাট অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেসরা ইলেকশানে জিতে এম পি হয়েছেন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মিনিস্টার হয়েছেন। এসব তো আপনার অজানা থাকার নয়।'

তনিমা বলল, 'দেখুন, ওঁদের কালচারটা একরকম। আমাদের বেঙ্গলে আরেক রকম। টোটালি ডিফারেন্ট—'

লঘু সুরে সুবিমল বললেন, 'আপনি হয়তো বলতে চাইছেন, এখানকার মানুষের মাইন্ড-সেটটা হল সোসাইটির যে কেউ পলিটিকস করুক মেনে নেব, কিন্তু সিনেমাওলারা যেন এর ত্রিসীমানায় না ঘেঁষে—এই তো?'

তনিমার উত্তর দেওয়া হয় না। কৃষ্ণকিশোর তাকে মনে করিয়ে দেন, 'বেঙ্গলেও কিন্তু দু-চারজন ফিল্মস্টার ইলেকশানে নেমেছেন। একজন জিতেও ছিলেন।'

নির্বাচনে নামতে রাজি হওয়ার পরও তনিমার যে দ্বিধা বা দোনামনা ভাবটা রয়েছে, কিষ্ণকিশোররা রীতিমতো সলিড দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটা উড়িয়ে দিতে চাইছেন। গোড়াতেই ক্যান্ডিডেট যাতে এলিয়ে না পড়ে সেজন্য ওঁদের চেষ্টার ত্রুটি

নেই। কিন্তু তনিমা এখনও দোদুল্যমান। বলল, 'আমার খুব ভয় হচ্ছে।' স্নায়ুচাপে সে যে ভুগছে, সুবিমলরা আসার আগে দেবনাথকে সে তো জানিয়েছিল।

কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের ভয়?'

তনিমা পালটা প্রশ্ন করল, 'আপনারা আমাকে জেতাবার জন্যেই তো মাঠে নামাতে চাইছেন?'

'অবশ্যই। আপনি জিতবেনও।'

মাথাটা ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁয়ে থেকে ডাইনে বারকয়েক ঘুরিয়ে তনিমা হাসে, 'ইমপসিবল। আমার জামানত, যদিও আপনাদের পার্টিই জমা দেবে—ফরফিটেড হয়ে যাবে। আমি ডাহা হারা হারব। লোকে দাঁত বার করে হাসবে। ইট উড বি আ ফার্স—'

কৃষ্ণকিশোররা হয়তো ধরেই নিয়েছিলেন, বাড়ি এসে টিকেট দেবার কথা বললে চিত্রতারকাটি মোমের মতো গলে পড়বে। উলটে সে এমন সব কথা বলছে যা অস্বস্তিকর। জবাব দিতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন কৃষ্ণকিশোর। অগত্যা সুবিমলকে হাল ধরতে হয়। তাঁর মাথা বরফের মতো শীতল। কখনও মেজাজ তপ্ত হয় না। অত্যন্ত বিচক্ষণ। যারা রাজনীতির মাঠ চষে বেড়াচ্ছে তারা জানে লোকটি একজন চতুর খেলোয়াড়। বেকায়দা পরিস্থিতিতে পড়লে কোন কৌশলে বেরিয়ে আসা যায় সেটা তাঁর জানা।

সুবিমলের মুখ আপন-করা হাসিতে ভরে যায়। ধীরে ধীরে বলেন, 'দিদিভাই, আপনার হারার সম্ভাবনা থাকলে কি টিকেট দিই? সিকিউরিটি ডিপোজিট ফরফিটেড় হলে আপনার অসম্মান যতটা, তার দশগুণ মুখ পুড়বে আমাদের দলের। মনে রাখবেন এটা একটা অল-ইন্ডিয়া পার্টি। ইলেকশান নিয়ে আমরা ছেলেখেলা করতে পারি না।'

তনিমা থতিয়ে যায়। এদিকটা সে খেয়াল করে নি। আচমকা কিছু মনে পড়তে বলে ওঠে, 'একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না স্যার—'

'কী দিদিভাই?'

গোড়ার দিকে 'ম্যাডাম' বলছিলেন সুবিমলরা। এখন তাঁদের গলায় অন্তরঙ্গতার সুর। ম্যাডাম দিদিভাই হয়ে গেছে। তনিমা সেটা লক্ষ করেছিল। দিদিভাইতে সে মজল না। স্যার বলছিল, সেটাই আপাতত বজায় রেখে বলে, 'আপনাদের পার্টিতে গুণময় সামন্ত, মল্লিনাথ দত্ত, হেমন্তকুমার লাহিড়ির মতো শ্রদ্ধেয় সব মানুষেরা রয়েছেন। দেশের জন্যে তাঁদের কত স্যাক্রিফাইস। শুনছি, ওঁদের নাকি এবার নমিনেশন দেওয়া হচ্ছে না।' রাজনীতিতে কস্মিনকালেও তনিমার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু দিন পনেরো হল অর্থাৎ যখন তাকে মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে সুবিমলদের সঙ্গে

দেবনাথের কথা চালাচালি শুরু হয় তখন থেকে সে কৌতূহল বোধ করতে থাকে। সুবিমলদের পার্টির সম্পর্কেই শুধু না, অন্য রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কেও কাগজে যা বেরোয়, রোজ সকালে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে-সব পড়ে। গুণময় সামন্ত, মল্লিনাথ দত্তদের খবর এভাবেই জেনেছে।

হিমশীতল যাঁর মস্তিষ্ক সেই সুবিমল রাহা এবার রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে যান। সেটা তাঁর চোখেমুখে ফুটে বেরোয়। কিন্তু যুবা বয়স থেকে পার্টি করে করে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। ধাতস্থ হতে সময় বেশি লাগে না তাঁর। ঠোঁটের কোনায় মনোরম একটি হাসি ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি ঠিকই শুনেছেন। তবে টিকেট দেওয়া হচ্ছে না—এটা সত্যি নয়। ওঁরা নিজেরাই ইলেকশানে নামতে চাইছেন না। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। শরীর নড়বড়ে হয়ে গেছে। লোকসভা নির্বাচন তো সামান্য ব্যাপার নয়। এখানে ওখানে দৌড় ঝাঁপ, পদযাত্রা, রোজ দশ-বিশটা করে সভা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটারদের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়ানো—এখন আর ওঁদের পক্ষে এত ধকল পোয়ানো অসম্ভব। তবে—'

'তবে কী?'

'ওঁরা আমাদের মাথার ওপর আছেন। ওঁদের পরামর্শ আর গাইডেন্স ছাড়া আমরা এক পা-ও ফেলি না।'

কৃষ্ণকিশোর চুপচাপ শুনছিলেন। এবার বললেন, 'আপনি আমাদের পার্টির টিকেটে কনটেস্ট করতে রাজি হয়েছেন। এখন আপনাকে নিজেদের একজন বলেই মনে করি। সুবিমলদা আপনাকে জানান নি। আমি পার্টির ভেতরকার একটা খবর দিচ্ছি—'

তনিমা উৎসুক হল।

কৃষ্ণকিশোর জানালেন, গুণময় সামন্তরা চার-পাঁচটা টার্ম ধরে পার্লামেন্টে যাচ্ছেন। আগে টগবগে ছিলেন, প্রবল এনার্জিতে ভরপুর। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে লোকসভা সরগরম করে রাখতেন। দেশের অর্থনীতি, বিদেশ নীতি ইত্যাদি নিয়ে যে-সব বক্তব্য পেশ করতেন সেগুলো নির্ভুল তথ্যে ঠাসা। বিপুল পরিশ্রমে রিসার্চ ওয়ার্ক করে এই সব ভাষণ তৈরি করা হত। বয়েস তাঁদের সব এনার্জি শুষে নিয়েছে। জাগতিক নিয়মেই তাঁরা এখন ক্লান্ত, প্রায়-স্থবির। স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে, রিফ্লেক্স হ্রাস পাচ্ছে। অনেক কিছুই তাঁরা ভুলে যান। ফলে সংসদে প্রশ্নোত্তরের সময় গোলামাল করে ফেলেন। পার্লামেন্ট তো আনন্দ ভ্রমণের বা আড্ডা দেবার জায়গা নয়। একজন এম. পি সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি। ইলেকটোরেটের প্রত্যাশার কথা মাথায় রেখে তাঁকে সারাক্ষণ তৎপর থাকতে হয়। কিন্তু শরীরের এবং মস্তিষ্কের সেলগুলোতে ক্ষয় ধরে যাওয়ায় বেশির ভাগ বৃদ্ধ

এম. পি লোকসভায় গিয়ে ঝিমোন। তাই পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারের নির্বাচনে নতুন প্রজন্মের কিছু জন-প্রতিনিধি তৈরি করা হবে, যাদের সারভিস বহুদিন পাওয়া যাবে। সোসাইটির নানা ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতী এবং খ্যাতিমান— যেমন ফিল্মস্টার, স্পোর্টসম্যান, লেখক—অথচ বয়স কম, তাঁদের কয়েকজনকে বাছাই করে নমিনেশন দেওয়া হচ্ছে। শরীরে তাজা রক্ত ঢুকলে দলের চেহারা আমূল পালটে যাবে।

কৃষ্ণকিশোর বলতে লাগলেন, 'আসলে টের পাচ্ছিলাম, বছরের পর বছর একই মুখ দেখতে দেখতে মানুষ খুব সম্ভব টায়ার্ড, হয়তো বিরক্তও। তারা নতুন মুখ চায়—ফ্রেশ, লাইভলি, এনার্জেটিক। সেই জন্যেই আপনাকে টিকেট দেবার কথা ভাবা হয়েছে।'

নতুন রক্ত। তাজা মুখ। তনিমা চমকে ওঠে। সে সাঁইত্রিশ পেরুতে চলল। চিত্রতারকাদের, বিশেষ করে নায়িকাদের তো বয়স বাড়ে না। ক'বছর ধরেই নিজেকে আটাশে আটকে রেখেছে সে। জন্মদিন আসে, জন্মদিন যায়। আটাশ আটাশই থাকে। কিন্তু তনিমা জানে, যৌবনের উত্তাল স্রোত থেমে এসেছে,এখন শুধুই ভাটার টান। তাদের ফিল্ম ওয়ার্ল্ডেও এখন ঝাঁকে ঝাঁকে নতুন মুখ। কুড়ি থেকে তেইশ-চব্বিশের মধ্যে বয়স। স্টুডিওগুলোতে কলরোল তুলে, রঙের ফোয়ারা ছুটিয়ে প্রজাপতির মতো তারা উড়ে বেড়ায়। তনিমা টের পায়, পায়ের তলায় জমি আর আগের মতো শক্ত নেই। তার পুরনো গ্ল্যামার এখনও অনেকটা আছে ঠিকই, কিন্তু আর কতদিন? ডিরেক্টর আর প্রযোজকদের তার সম্বন্ধে আগ্রহ আছে ঠিকই, তবে আগের মতো নতুন নতুন ছবিতে 'সাইন' করাবার জন্য ততটা হামড়ে পড়ে না। মনে মনে তনিমা টের পায় সে পিছু হটছে। সিনেমায় পুরনো হয়ে আসার মুখে হলেও রাজনীতিতে, যেখানে কোঁচকানো চামড়া, কোমরে বাত, ঘোলাটে হয়ে যাওয়া চোখ—এই জাতীয় নেতাদের ভিড় বেশি, সেখানে সে তো আনকোরা টাটকাই। শো-বিজনেসেই শুধু না, দেখা যাচ্ছে সব জায়গাতেই চাই নতুন নতুন মুখ।

তনিমা খানিক চিন্তা করে বলল, 'আপনারা কিন্তু ট্রিমেন্ডাস রিস্ক নিচ্ছেন স্যার—'

সুবিমল কৃষ্ণকিশোর, দু'জনেই কিছুটা অবাক। একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের রিস্ক?'

'আমার মতো একজন আনাড়িকে পলিটিকসে টেনে নিয়ে যাওয়াটা ঝুঁকি নয়?'

ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল দেবনাথ। রাগে মাথার তালু ক্রমশ তপ্ত হচ্ছে। এত বকবকানি কেন মেয়েমানুষটার? সুবিমল আর কৃষ্ণকিশোরের মতো ওজনদার

নেতারা বাড়ি এসে ইলেকশানের টিকেট দিতে চাইছেন। কোথায় কৃতার্থ হয়ে যাবে। তা না, একটার পর একটা হাবিজাবি প্রশ্ন তুলেই চলেছে। তিতিবিরক্ত হয়ে সুবিমলরা হঠাৎ যদি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, আপনার যখন এত অনিচ্ছা আমরা চললাম। নমস্কার—' তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? এত বড় একটা সুযোগ যেচে ঘরে এসে ঢুকেছে, আর মেয়েছেলেটা সাত-সতেরো ফ্যাকড়া তুলে সেটা হাতছাড়া করতে চলেছে? মাথামোটা, গাড়ল, হদ্দ ইডিয়ট।

তনিমার পাশাপাশি বসে ছিল দেবনাথ। সে সোফার হাতলের তলা দিয়ে নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে তার উরুতে আঙুলের খোঁচা দেয়। বোঝাতে চায়, সে যেন আর আজেবাজে কথা বলে ঝামেলা না পাকায়। তনিমা খোঁচাটা গ্রাহ্য করে না।

সুবিমল পালটা প্রশ্ন করেন, 'কেন—ঝুঁকি হবে কেন?'

তনিমা বুঝিয়ে দিল, রাজনীতির ব্যাপারে সে একেবারেই আকাট। কোনও রকম অভিজ্ঞতাই নেই। বলল, 'এমন একজন ক্যান্ডিডেটকে লোকে ভোট দেবে কেন?'

রহস্যময় হাসেন সুবিমল, 'দেবে, দেবে। এ নিয়ে ভাববেন না।'

'কিন্তু—'.

হাত তুলে তনিমাকে থামিয়ে দিতে দিতে সুবিমল বলেন, 'ওটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন না—'

কেমন একটা গোঁ চেপে বসে তনিমার ঘাড়ে। জেদি গলায় বলে, 'আমি একজন প্রার্থী। কেন আমি ভোট পাব, সেটা আমাকে জানাবেন না?'

সুবিমল আগেই টের পেয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনে টিকেটের মতো দুর্লভ ট্রফিটি হাতে পেলে যারা ভাবে হাতের মুঠোয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পেয়ে গেল, এ-মেয়ে তেমনটা নয়। তিনি কিন্তু মোটেও চটেন না। মুখমণ্ডলে প্রশান্ত হাসিটি লেগেই ছিল। বললেন, 'নিশ্চয়ই জানাব। একটা ফেমাস প্রোফেশনাল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলাম। তাঁরা একটা মাস এক্সটেনসিভলি সার্ভে করে আমাদের রিপোর্ট দিয়েছে।'

হতবাক তনিমা তাকিয়েই থাকে। অনেকক্ষণ তার চোখে পাতা পড়ে না। এক সময় বলে, 'ভোটে ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ! আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।'

সুবিমলের হাসি আরেকটু চওড়া হয়, 'দিনকাল একেবারে পালটে গেছে দিদিভাই। এখন নিজেরা কেউ কিছু করে না। ইন্ডাস্ট্রিতে লগ্নি করা হবে? চাই প্রোফেশনাল ম্যানেজমেন্ট। অফিসে রিক্রুটমেন্ট করতে হবে? প্রোফেশনাল ম্যানেজমেন্ট ছাড়া গতি নেই। কোনও ফার্মে কতজনকে ভি. আর. এস ধরাতে হবে, সেখানেও চাই প্রোফেশনালদের অ্যাডভাইস। সব জায়গায় যদি ওদের ডাকা হয়, ইলেকশানই বা বাদ যাবে কেন?'

সুবিমল সবিস্তার জানাতে থাকেন। এতকাল ভোটের আগে তাঁদের সাধারণ কর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে হাওয়া বুঝতে যেত। এখনও যায়। মাঝে মাঝে নেতারাও জন-সংযোগের জন্য যান। কিন্তু এ-সব পুরনো মেথড। সব রাজনৈতিক দলই স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচন থেকে এটা করে আসছে। কিন্তু সাবেক পদ্ধতিতে আর পুরোটা চলছে না। সেকেলে কায়দা-টায়দা তো আছেই, তার পাশাপাশি এই কাজে এবার সুবিমলদের পার্টি প্রোফেশনালদেরও নিয়োগ করেছে। কোন কৌশলে, কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় গোপনে গোপনে, একান্ত নীরবে এরা ভোটারদের নাড়ির খবর বার করে আনে, তারাই জানে।

যত শুনছে, বিস্ময় অবিরল বেড়েই চলেছে। তনিমা বলে, 'ইলেকশান জুন মাসে হবে, এই তো সেদিন ডিক্লেয়ার করা হল। আপনি তো তার দু'মাস আগেই সার্ভে করিয়েছেন!'

সুবিমল বললেন, 'ইলেকশান হচ্ছেই, এটা তো জানা ছিল। মে, নইলে জুনে। আমরা আগে থেকেই ময়দানে নেমে পড়েছিলাম।'

খানিক আগের কথার সুতো ধরে তনিমা জিজ্ঞেস করে, 'আপনাদের সেই প্রোফেশনাল গ্রুপের সার্ভে রিপোর্টে কী আছে?'

প্রশ্নটার সোজাসুজি উত্তর দিলেন না সুবিমল। একটু ঘুরিয়ে বললেন, 'কলকাতা নর্থ-ওয়েস্ট সিটটার জন্যে আমরা আপনার সঙ্গে আরও তিনটে নতুন নাম সিলেক্ট করে গ্রুপটাকে দিয়েছিলাম। মানে—'

শিরদাঁড়া টান হয়ে গেল তনিমার। সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে বলল, 'মানে, একমাত্র আমার কথাই আপনাদের পার্টি ভাবেনি, এই তো?'

সুবিমল সামান্য বিব্রত হলেন। তনিমার বলার ভঙ্গিতে যে অনুযোগ রয়েছে লহমায় ধরে ফেললেন। কিন্তু তিনি ধুরন্ধর জননেতা, পার্টির নাম-করা সংগঠক। হেসে হেসে বলতে লাগলেন, 'বুঝতেই তো পারছেন, আমাদের অল ইন্ডিয়া পার্টি। জনগণ কাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, সেটা ভালো করে জেনে নিয়ে তবে তো নমিনেশন দিতে হবে।' গলার স্বর তরল করে বললেন, 'প্রোফেশনালদের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে আপনি ফ্লাইং কালারসে বেরিয়ে এসেছেন। ওই কনস্টিটিউয়েন্সির মানুষ আপনাকে ভীষণভাবে চাইছে।'

পরিমল ওধার থেকে বলে ওঠে, 'রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, আপনি মিনিমাম আড়াই থেকে তিন লাখ ভোটের মার্জিনে জিতে যাবেন।'

কপাল সামান্য কুঁচকে তনিমা বলল, 'তা-ই!' বলেই নজরটা সুবিমলের মুখের ওপর স্থির করল, 'আমি ছাড়া আপনাদের পছন্দের লিস্টে অন্য যে তিনজন ছিলেন তাঁরা কারা?'

সুবিমল দুই হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'প্লিজ দিদিভাই, প্লিজ। আপনার এই কৌতূহলটা মেটাতে পারব না। নিজের নিজের ফিল্ডে ওঁদেরও যথেষ্ট সুনাম। সার্ভে অনুযায়ী আপনাকে নমিনেশন দেওয়া হচ্ছে, এটা জানাজানি হলে ওঁরা ক্ষুব্ধ হবেন। আমাদের পার্টির পক্ষে সেটা হবে ভীষণ এমবারাসিং ব্যাপার।'

আরেক প্রস্থ চা তৈরি করে সবাইকে দিতে দিতে তনিমা বলল, 'আমার মনে হয় কোথাও একটা ভুল হচ্ছে—'

এবার কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের ভুল?'

'যে ম্যানেজমেন্ট গ্রুপটা সার্ভে করেছে তারা ঠিকমতো জনমত যাচাই করতে পারেনি।'

'ওদের এফিসিয়েন্সি সম্পর্কে আমরাই শুধু না, যারা ওদের অ্যাসাইনমেন্ট দেয় তাদের কারও কোনও অভিযোগ নেই। সবাই খুশি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর তনিমা বলল, 'সার্ভে রিপোর্টে যা-ই থাক, আমার কিন্তু অস্বস্তি থেকেই যাচ্ছে।'

সুবিমল জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের অস্বস্তি?'

'আমি দেশের জন্যে কোনও দিন কিছু করিনি। আমার এতটুকু স্যাক্রিফাইস নেই। তবু আমাকে লোকে ভোট দিতে যাবে কেন?'

সুবিমল প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে পরিমলকে ইশারা করলেন। যুবনেতাটি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'কী বলছেন আপনি! এই যে বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ মানুষকে কত রকমের রোলে অভিনয় করে হাসাচ্ছেন, কাঁদাচ্ছেন, আনন্দ দিয়ে আসছেন—এটা দেশের কাজ নয়?'

তনিমার চোখ পরিমলের দিকে ঘুরে গেল। হেসে হেসে সে বলে, 'দেশের কাজের ডেফিনিশনটা বদলে গেছে বলছেন?'

পরিমল থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু পার্টি করে তো। যে-প্রশ্নটা তাকে করা হয়েছে সেটা সামাল দিতে খুব বেশি সময় লাগে না। 'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন দিদি, ফর্টি সেভেনের পর সাতান্ন বছর কাটতে চলল। এর মধ্যে তিন-চারটে জেনারেশন পার হয়ে গেছে। কে কবে স্বাধীনতার জন্যে পুলিশের গুলি কি লাঠি খেয়েছে, জেল খেটেছে, সে-সব নিয়ে আজকাল আর কেউ মাথা ঘামায় না। কে যেন বলেছিল—বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। ঠিকই বলেছিল—'

পরিমলের মুখের ওপর থেকে চোখ সরাল না তনিমা। তাকিয়েই থাকে সে।

পরিমল বলতে লাগল, 'ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, পায়ে সস্তা চপ্পল, বাসে-ট্রামে ভিড়ের ভেতর গুঁতোগুঁতি করে যাতায়াত করে—এই ধরনের ক্যান্ডিডেটকে ভোটের বাজারে এখন আর কেউ চায় না।'

তনিমার দু-চোখে কৌতুক নাচতে থাকে। 'আপনি বলতে চাইছেন, লোকে এখন গ্ল্যামারওলা ক্যান্ডিডেট পছন্দ করে—তাই তো?'

'এক্‌জাক্টলি। আপনি ঠিক ধরেছেন দিদি—' পরিমলের সমস্ত মুখে হাসি ফুটে উঠে দু'ধারের কান অব্দি ছড়িয়ে পড়ে।

চোখ ছোট করে তনিমা বলে, 'বুঝতে পারছি, আমার যেটুকু গ্ল্যামার এখনও রয়েছে সেটাকে আপনারা ইলেকশানে কাজে লাগাতে চাইছেন। অ্যাম আই রাইট?'

দেবনাথ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বিরক্তি বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। বাড়ছে মেজাজের তাপাঙ্ক। কখন যে মেয়েমানুষটা বকর বকর থামাবে? ইচ্ছা করছে ঠাস ঠাস ক'টা চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়। অগত্যা সুবিমল আর কৃষ্ণকিশোরের অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে টানতে লাগল। যতটা সম্ভব উদাসীন থাকতে চেষ্টা করছে।

পরিমল তোতলাতে লাগল, 'মানে—মানে—'

অনন্ত ধৈর্য যাঁর সেই সুবিমল বললেন, 'আপনার গ্ল্যামার, আপনার ক্যারিসমা, আপনার পপুলারিটি—এসব তো সামান্য ব্যাপার নয়। এগুলো কাজে লাগিয়ে যদি নির্বাচনে জেতা যায়, আপনি আরও বড় আকারে দেশের কাজ করতে পারবেন। আমাদের পার্টির চাইতেও কান্ট্রি আরও বেশি উপকৃত হবে।'

সুবিমল রাহার মুখ থেকে স্তুতি ঝরে ঝরে পড়ছে। গোদা বাংলায় যাকে বলে আমড়াগাছি। ভদ্রলোক মানুষ চরিয়ে খান। কথার মারপ্যাঁচে কী করে কাজ গুছিয়ে নিতে হয় সেই শিল্পকলা ভালোই জানেন।

মন্দ লাগছিল না তনিমার। কুল কুল করে পেটের ভেতর থেকে হাসি উঠে আসছিল। অতি কষ্টে সেটা ঠেকিয়ে রেখে বলল, 'দেশের মানুষের কাছে আমি যে এতটা ভ্যালুয়েবল, জানতাম না। ঠিক আছে, ইলেকশানে নামার জন্যে আমার কনসেন্ট দেবনাথ তো আপনাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছে। সামনাসামনি বসে আমিও বলছি, নামব।'

সুবিমলরা ভীষণ খুশি। কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'এত দিন ক্যামেরার সামনে কয়েক হাজার বার দাঁড়িয়েছেন। এবার যাদের জন্যে বই করেন, সোজা সেই পিপলের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবেন। দুর্দান্ত একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে।'

মনে মনে একটু ভেবে তনিমা বলল, 'তা হয়তো হবে কিন্তু পিপলকে ক্যান্ডিডেটরা কীভাবে ফেস করে, তাদের সামনে কীভাবে বক্তৃতা দেয়, সে-সব সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই।'

সুবিমল বললেন, 'ও-সব নিয়ে ভাববেন না। ওদিকটা আমরা দেখব। আচ্ছা আপনি তো ভীষণ বিজি আর্টিস্ট। শুনেছি আপনার রোজই শুটিং থাকে—'

চার-পাঁচ বছর আগে রোজ সকাল-বিকেল দু'শিফটে কাজ করেছে তনিমা। বেশিব ভাগ দিন রাতের শিফটেও। রবিবারও বাদ নেই। একটা করে শিফট শেষ হতে না-হতেই অন্য ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজার এয়ার-কন্ডিশনড গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। তাকে তুলে এক স্টুডিও থেকে আরেক স্টুডিওতে বা লোকেশনে চলে যেত। তার ডেট পাওয়ার জন্য প্রডিউসাররা লাইন লাগিয়ে দিত। কত সাধ্যসাধনা, হাতজোড় করে কত কাকুতি-মিনতি। কেউ কেউ পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। ছ'মাস পরেও দু-চারটে ডেট পেলে তারা হাতের মুঠোয় আকাশের চাঁদ পেয়ে যেত। সেই সব সোনার দিন আর নেই। তবু তার রেশ খানিকটা খানিকটা থেকে গেছে। মাসে এখনও কুড়ি-বাইশ দিন তার শুটিং থাকে। তিন শিফট আজকাল স্বপ্ন। এক শিফটই বেশি, ক্বচিৎ দু'শিফট। চাহিদা যে কমছে তা তো আর ঢেঁড়া পিটিয়ে জানানো যায় না। মিডিয়ার লোক ইন্টারভিউ নিতে এলে বলে 'বাজে ছবি করা বন্ধ করে দিয়েছি। স্টোরি, স্ক্রিপ্ট, ক্যারেক্টার পছন্দ হলে তবেই সাইন করি।'

তনিমা জিজ্ঞেস করে, 'শুটিংয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন স্যার?'

সুবিমল বললেন, 'আপনার টাইট শুটিং শিডিউলের ভেতর টাইম বার করে উইকে আমাদের দু-একটা ডেট যে দিতে হবে দিদিভাই—'

মাসের প্রতিটি দিন যে তার শুটিং থাকে না, সেটা সুবিমলের জানা নেই। এতে আরামই বোধ করে তনিমা। তবে অবাক হয় অন্য একটা কথা ভেবে। জিজ্ঞেস করে, 'কী জন্যে ডেট চাইছেন?'

'আপনার জন্যে আমরা একটা প্রোগ্রাম ঠিক করেছি।'

'কিসের প্রোগ্রাম?'

'যে প্রোফেশনাল গ্রুপটাকে দিয়ে আপনার ব্যাপারে সার্ভে করিয়েছিলাম তারা সপ্তাহে দু-দিন আপনার কাছে আসবে। কোন কোন দিন, কোন কোন সময় এলে অসুবিধা হবে না, কাইন্ডলি যদি বলেন—'

কয়েক পলক বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে তনিমা। তারপর বলে, 'সার্ভে তো হয়েই গেছে। ওঁরা আমার কাছে আসবেন কেন?'

সুবিমল বললেন, 'ইলেকশানে কনটেস্ট করতে যাচ্ছেন, ফিল্মস্টার থেকে জনগণের নেত্রী হবেন। তার আগে আপনার নতুন একটা ইমেজ তৈরি করে দিতে হবে।'

তনিমা অগাধ সমুদ্রে গিয়ে পড়ল যেন। ধীরে ধীরে বলল, 'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সুবিমল তাঁদের পবিকল্পনা বিশদভাবে জানিয়ে দিলেন। যে লোকসভা কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে তনিমাকে দাঁড় করানো হচ্ছে সেটা তো একটুখানি জায়গা নয়। বিশাল এলাকা জুড়ে তার বিস্তর। নানা ভাষাভাষী মানুষ—বিহারি, বাঙালি, ওড়িয়া, শিখ, মাড়োয়ারি, গুজরাতি, বনেদি বড়লোক, গরিব হাভাতে, কেরানি, ফেরিওলা, ঠেলাওলা, ভুজাওলা, চা-ওলা, কনট্রাক্টর, উকিল, ছোট দোকানদার, বড় বিজনেসম্যান, ফড়ে, জমিবাড়ির দালাল—সব মিলিয়ে বিপুল পাঁচমেশালি জনতা। কী নেই এখানে? সেকেলে রাজপ্রাসাদ আর জমিদারদের বাড়ির পাশাপাশি আদ্যিকালের জীর্ণ দালানকোঠা, চাপবাঁধা খেলার চালের বস্তি, বেশ্যাপল্লী, পুরনো বাড়ি ভেঙে কোথাও মাথা তুলেছে ঝাঁ-চকচকে হাই-রাইজ। চওড়া চওড়া বাস রাস্তা, ট্রাম রাস্তা যেমন আছে তেমনি রয়েছে জিলিপির প্যাঁচের মতো সরু সরু বাহান্ন পাকের কত যে গলি!

বিভিন্ন এলাকায় কোথায় গিয়ে কী বলতে হবে, কতটুকু হাসতে হবে, কী ধরনের পোশাক পরে যেতে হবে—প্রোফেশনাল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের লোকেরা সে-সব ঠিক করে দেবে। ছোট বড় নানা জনসভায় তনিমা যে ভাষণ দেবে তাও লিখে দেবে ওরা। সেগুলো মুখস্থ করে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু উগরে দিতে হবে। বছরের পর বছর হাজার হাজার পাতা সিনেমার সংলাপ কণ্ঠস্থ করতে হয়েছে তাকে। সামান্য ক'টা ভাষণ কি আর মনে রাখতে পারবে না? কখন কণ্ঠস্বর উঁচুতে তুলতে হবে, কখন ঢেলে দিতে হবে আবেগ, কখন বিরোধী পার্টির বিরুদ্ধে তোপ দাগার সময় গলায় শ্লেষ মেশাতে হবে—ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের লোকেরা সে-সব তালিম দেবে।

শুনতে শুনতে চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল তনিমার। বলল, 'এ তো একেবারে সিনেমার মতো ব্যাপার। ডিরেক্টররা যেভাবে যেভাবে মেপে মেপে হাসতে বলে, কাঁদতে বলে, স্ক্রিপ্ট-রাইটারদের লেখা ডায়লোগ আওড়াতে বলে, এখানেও তাই। ডিরেক্টরের বদলে ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ। শুধু ক্যামেরাটা থাকছে না।'

হেসে হেসে সুবিমল বললেন, 'প্রাইভেটলি আপনাকে বলছি, ভোটের পলিটিকস এখন ভেরি ভেরি বিগ শো। সিনেমা এর ধারে কাছে আসে না।'

তনিমাও হাসল, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

সুবিমল বলতে থাকেন, 'আপনার ইমেজ যাতে আরও ব্রাইট আরও চোখধাঁধানো হয়, ম্যানেজমেন্টের ছেলেরা সেজন্যে অনেক রকম প্ল্যান করেছে।'

'কী প্ল্যান?'

'সেটা ওরাই জানাবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সুবিমল জিজ্ঞেস করেন, 'আমাদের ডেটের কী হবে?'

কিছুক্ষণ ভেবে তনিমা বলল, 'শনি আর রবি, এই দু'দিন বিকেলের দিকে, ধরুন পাঁচটা থেকে ছ'টা, এক ঘণ্টার মতো সময় দিতে পারি।'

'এনাফ, এনাফ।'

'ক'উইক এই ট্রেনিং চলবে?'

'চার উইক। ম্যাক্সিমাম পাঁচ। অসুবিধা হবে না তো?'

'না।'

সুবিমল বললেন, 'কথা হয়ে গেল। আজ তা হলে চলি।'

সবাই উঠে দাঁড়ায়।

সুবিমল হাতজোড় করে এবার বলেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভালো লাগল।'

তনিমা বলল, 'আমারও ভালো লেগেছে। আগড়ম বাগড়ম কথা বলে আপনাদের অনেক বিরক্ত করেছি। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।'

'কিসের বিরক্তি! কেউ অচেনা একটা ফিল্ডে কাজ করতে যাচ্ছে, তার তো সমস্ত কিছু জেনে বুঝে পা বাড়ানো উচিত। আপনি যে ডিটেলে সব জেনে নিয়েছেন, সেজন্যে আমরা ভীষণ খুশি। আমাদের নতুন ক্যান্ডিডেট যে কতটা সিরিয়াস, এর থেকে বোঝা যায়। আচ্ছা নমস্কার। ম্যানেজমেন্টের ছেলেরা তো আসবেই। আমাদেরও ইলেকশানের ব্যাপারে তেমন কিছু দরকার হলে আসতে হবে।'

'নিশ্চয়ই আসবেন।'

সুবিমলদের দরজা অব্দি এগিয়ে দেয় তনিমা। দেবনাথ ওঁদের সঙ্গে নিচে নেমে গেল। তিন জননেতাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে। শিষ্টাচারই শুধু নয়, দেবনাথ জানে, লোকসভা নির্বাচনে একটা বড় রাজনৈতিক দলের টিকিট পাওয়া কতটা কঠিন। সুতরাং সুবিমলদের তোয়াজ করাটা ভীষণ জরুরি।

ওরা চলে গেলে আবার সোফায় এসে বসে পড়ল তনিমা।

দুই

সন্ধে নেমে গিয়েছিল বেশ কিছুক্ষণ আগেই। চারপাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। এগারো তলার উচ্চতা থেকে দূরের আলোকোজ্জ্বল রাস্তাটাকে স্বপ্নের মতো মনে হয়। বছরখানেকের মধ্যে ওখানে নতুন নতুন শপিং কমপ্লেক্স, ঝকঝকে রেস্তোরাঁ, ঘড়ির শো-রুম, হায়দ্রাবাদি পার্লসের শো-রুম, ইত্যাদি কত কিছু যে খোলা হয়েছে। সবগুলোই বাতানুকূল। মাথায় জ্বলছে নানা রঙের নিওন। অজস্র গাড়ি ছুটে যাচ্ছে দুরন্ত গতিতে।

এতটা উঁচুতে বসে রাস্তার কোলাহল বা যানবাহনের আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না। বাতাসের স্তর ভেদ করে যে ক্ষীণ শব্দ উঠে আসছে তা যেন অন্য কোনও পৃথিবীর। উদাসীন চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে তনিমা।

মিনিট দশেক বাদে ফিরে এসে তনিমার সামনের সোফাটায় শরীরের ভার ছেড়ে হেলান দিয়ে বসল দেবনাথ। খানিক আগের বিরক্তি, ক্রোধ, উৎকণ্ঠা—সব উধাও। তীব্র মানসিক চাপের পর এখন তার চোখ-মুখ থেকে আরাম চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে।

দেবনাথ বলল, 'যেভাবে একটার পর একটা ফ্যাকড়া তুলছিলে, ভাবলাম সব চৌপট হয়ে গেল। রাগে মাথায় আগুন ধরে যাচ্ছিল।'

তনিমা বলে, 'সেটা তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম। জানি তো, একটুতেই ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। একটা সুযোগ এসেছে বলে হামড়ে পড়লে কী ভাবতেন ওঁরা? আমি হ্যাংলা, আমি গ্রিডি!' সুবিমলদের সঙ্গে খানিক আগে খুব সহজভাবে, ঠান্ডা মাথায় কথা বলছিল ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দেবনাথের ওপর মেজাজটা তপ্ত হয়েই ছিল। তার কথাগুলো থেকে ঝাঁঝ বেরিয়ে আসতে থাকে।

হ্যা হ্যা করে খানিকটা হেসে, এক ঝটকায় নিজেকে টেনে তোলে দেবনাথ। এধারে এসে তনিমার পাশে ঘন হয়ে বসে তার কাঁধে বাঁ হাতের বেড় দিয়ে কাছে টানতে টানতে বলে, 'ডার্লিং, তুম লা-জবাব—'

ঘাড় বাঁকিয়ে নীরস গলায় তনিমা বলে, 'মানে?'

'সুবিমলবাবুরা ডাইরেক্টলি অফারটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে লোভে যদি তোমার জিভ লক লক করত, ওঁদের চোখে তুমি খেলো হয়ে যেতে। এদিকটা আগে আমি ভেবে দেখিনি। তাই মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল।' দেবনাথ বলতে লাগল, 'পরে মনে হল, যা করেছ, ঠিক করেছ—'

মেজাজটা এবার একটু নরম হল তনিমার।—'মানছ তা হলে?'

'হাজার বার মানছি।' বাঁ হাত তনিমার কাঁধে, ডান হাতের মাঝের আঙুল দিয়ে তার চিবুকটা নাড়তে নাড়তে দেবনাথ বলল, 'ঘাঘু পলিটিশিয়ানদের যেভাবে নাচাচ্ছিলে, কে বলবে তুমি আটাগুড়ির সেই গৌরী! আমার ছুনুমুনু, তুমি একখানা টেরিফিক খেলোয়াড়!' ভাব উথলে উঠলে তনিমাকে সে ছুনুমুনু বলে ডকে।

তনিমার হয়তো এবার মজা লাগছে। চোখ দু'টো আধাআধি বুজে দেবনাথকে লক্ষ করতে থাকে।

দেবনাথ কী করবে যেন ভেবে পাচ্ছিল না। আচমকা তনিমার গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে শব্দ করে চুমু খায়। বলে, 'আমার কী ইচ্ছে হচ্ছে, জানো? তোমাকে কাঁধে চাপিয়ে হোল কলকাতায় চক্কর মেরে আসি।'

সুপারস্টার বা গ্ল্যামার কুইন যাই বলা যাক না, আসলে তনিমা কাঁচা খিস্তি করতেও জানে। দেবনাথকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'ছেনালি থাক—'

একটু চিন্তা করে নেয় দেবনাথ। তারপর বলে, 'ঠিক আছে, ঘরে বসেই একটু সেলিব্রেট করা যাক।'

'কিসের সেলিব্রেশন?'

'হেই মা কালী! আজ এত বড় একটা ব্যাপার ঘটল। তুমি ইলেকশানে কনটেস্ট করতে ফাইনাল কথা দিলে। আর একটু ফুর্তি ফাত্তা হবে না?'

কপাল কুঁচকে তনিমা বলল, 'তোমার ফুর্তি মানে তো মদ গেলা—'

দেবনাথ বলে, 'ছুনুমুনু, মদ ব্রিংগস ড্রিম। আজ স্বপ্নের দিন—'

'সে তো রোজ রাত্তিরেই গিলছ। ডিনারের আগে ওসব হবে—'

'উঁহু—' শরীরে ঝাঁকি মেরে উঠে দাঁড়ায় দেবনাথ। 'আজ একটা স্পেশাল ডে। সন্ধে থেকেই শালা ফাটাফাটি লাগিয়ে দেব। আজ প্রাইভেট সেলিব্রেশন। স্রেফ তোমার আর আমার। তারপর সুবিমল রাহারা তোমার নামটা একবার অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স করুক। ফিল্মের লোকজন, বন্ধুবান্ধবদের জন্যে ফাইভ-স্টার হোটেলে একটা পার্টি থ্রো করব—'

লিভিং রুমের গায়ে একটা অ্যান্টি-রুম। সেখানে রয়েছে ছোটখাটো সেলার। সেলার থেকে নিজেই দামি হুইস্কির বোতল নিয়ে আসে দেবনাথ। একটা কাজের লোককে —নাম শিবু—ডেকে পকেট থেকে একশো টাকার ক'টা নোট বার করে দিয়ে বলল, 'চট করে 'স্কাইলার্ক' থেকে ফিশ ফিঙ্গার, কাবাব, আর চিকেন কাটলেট নিয়ে আয়। আমাদের জন্যে ডিনারের অর্ডার দিয়ে আসবি। বিরিয়ানি, মাটন চাঁপ। দশটার ভেতর যেন দিয়ে যায়। তোরা তোদের মতো রান্না করে নিস। যাবার আগে বরফ দিয়ে যা—'

'দিচ্ছি সাহেব—' শিবু ভেতরের একটা ঘরে চলে গেল। সেখানে ফ্রিজ, ক্রকারি ইত্যাদি রয়েছে। বছর চার পাঁচেক হল এই পশ এলাকার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছে দেবনাথরা। তার আগে ছিল চেতলার একটা ফ্ল্যাটে। সেখানে দেবনাথকে কাজের লোকেরা দাদা বলত। এখানে আসার পর কড়া ফরমান জারি করা হয়েছে। তাকে 'সাহেব' বলতে হবে। তনিমা আগের মতো 'দিদি'ই থেকে গেছে। মেমসাহেব টেমসাহেব ডাকটা তার খুব একটা পছন্দ নয়। এই নিয়ে আগে আগে দেবনাথ টিটকিরি দিত, 'মহানায়িকা হলেও আটাগুড়ির গন্ধটা গা থেকে ঘুচল না। এখনও দিদি— রাব্বিশ।'

শিবু জানে বরফ চাইলে শুধু বরফই না, আরও কী কী আনতে হবে। একটা সুদৃশ্য লম্বাটে কাট-গ্লাসের লম্বা পাত্রে টুকরো টুকরো বরফ, ফর্ক, চামচ, প্লেট ইত্যাদি এনে টেবলে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল। সেই সঙ্গে কিছু কাজুবাদাম। কাজুটা ড্রিংকের সঙ্গে আপাতত ঠেকনো দিয়ে যাবে। সত্যিকার সঙ্গত করার জন্য কয়েক মিনিটের ভেতর কাবাব টাবাব আসবে। 'স্কাইলার্ক' রেস্তোরাঁটা সামনের মেইন রাস্তায়। বিরাট একটা ইন্টারন্যাশন্যাল রেস্তোরাঁ গ্রুপ মুম্বাই দিল্লির পর কলকাতায় তাদের ক'টা আউটলেট খুলেছে। সবগুলোর নামই এক—'স্কাইলার্ক'। অন্যগুলোর মতো সামনের মেইন রাস্তার 'স্কাইলার্ক'ও এয়ার-কন্ডিশনড, ঝকঝকে।

দেবনাথের তর সইছিল না। ক্ষিপ্র হাতে হুইস্কির বোতল খুলে দু'টো ডিকান্টারে ঢেলে বরফের টুকরো ফেলে দিল। একটা পানপাত্র উঁচুতে তুলে গলায় খুশির লহর তুলে বলল, 'চিয়ার্স—'

মদ্যপানটা বিশেষ পছন্দ করে না তনিমা। দেবনাথের পাল্লায় পড়ে রোজ ডিনারের আগে এক-আধ পেগ সে যে খায় না তা নয়। ফিল্মের পার্টি থাকলেও খেতে হয়। পার্টির যা কালচার। তবে বেশির ভাগ সময় পানীয়ের গেলাস হাতে নিয়ে বসে থাকে, নইলে অন্য গেস্টদের জটলায় ঘুরে বেড়ায়।

এই ভর সন্ধেয় ড্রিংক করতে মোটেও ইচ্ছা হচ্ছিল না তনিমার। কিন্তু আপত্তি করে পার পাওয়া যাবে না। দেবনাথ কোনও মতেই তাকে ছাড়বে না। গেলাস তুলে দেবনাথের গেলাসে ঠেকিয়ে সে বলল, 'চিয়ার্স—'

পাকস্থলীতে মদ ঢুকলে দেবনাথের ভেতর একটা টকিং মেশিন 'অন' হয়ে যায়। মিনিটে পাঁচশো করে শব্দ তোড়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। সে বলতে লাগল, 'ডার্লিং, আমার কী মনে হচ্ছে জানো? তুমি আর আমি স্বপ্নের ভেতর ভেসে বেড়াচ্ছি। হোল ওয়ার্ল্ড আজ আমাদের মুঠোয় ঢুকে গেছে।'

তনিমা জানে, পেটে যত মদ পড়বে, বকবকানির মাত্রাটা ততই বাড়তে থাকবে দেবনাথের। সে নিজের গেলাসে মাঝে মধ্যে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে ঠিকই। দু-চার ফোঁটা

ভেতরে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। উদাসীন দৃষ্টিতে কয়েক পলক সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থাকে। সুবিমল রাহারা আসার আগে দেবনাথ যেভাবে হাতের আঙুলে টাকা বাজাবার মুদ্রা ফুটিয়েছিল, অবিকল তেমনটি করে বলল, 'তখন তুমি বলছিলে, আমি এম. পি হলে টাকা আসবে—'

দেবনাথ গলার স্বর অনেক উঁচুতে তুলে বলল, 'প্রচুর, প্রচুর। প্লেনটি। চারদিক থেকে টাকার বান ডেকে যাবে। এত আসবে যে রাখবার জায়গা পাওয়া যাবে না।'

'কিভাবে, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

আগের বার এ-জাতীয় প্রশ্ন করায় রগড় করে তনিমাকে দুগ্ধপোষ্য বালিকা বলেছিল দেবনাথ। এবার তার ধার দিয়েও গেল না। বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল, একবার কোনও রকমে এম. পি হতে পারলে আলিবাবা আর চল্লিশ ডাকাতের গল্পে যেমন আছে তেমনি হাজারটা রত্নগুহার দরজা খুলে যাবে। দিল্লিতে বাংলো, যত ইচ্ছা ফোন, যত ইচ্ছা বিজলি, গন্ডা গন্ডা এয়ার-কন্ডিশনার, যত বার খুশি কম্পানিয়ন নিয়ে প্লেনে চড়ো, দশটা অ্যাটেনডান্ট, একশো রকমের অ্যালাওয়েন্স, পাঁচ বছর পর বাকি জীবনের জন্যে পেনশন, নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে কাজ করার জন্য বছরে দু কোটি টাকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মানে অঢেল আরাম। তার মানে আজস্র সুখ। কিন্তু এ-সব হল ফাউ।

গলার ভেতর হুঁ হুঁ আওয়াজ করে চোখ নাচাতে নাচাতে দেবনাথ বলে, 'আসলটা এবার শোনো—'

তনিমা অবাক। 'ফাউ, আসল—মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এর মধ্যে দু পেগ গলায় চালান করা হয়ে গেছে। এখন তিন নম্বর চলছে দেবনাথের। শিবু কাবাব টাবাব নিয়ে এসেছিল। ড্রিংক ভালোই জমে উঠেছে।

দেবনাথ বলল, 'পার্লামেন্টে টোটাল কতজন মেম্বার জানো? একজাক্ট ফিগারটা বোধ হয় পাঁচশো তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ। ইন্ডিয়ার একশো দশ কোটি লোকের রিপ্রেজেন্টেটিভ মাত্র ফাইভ হানড্রেড ফর্টি থ্রি কি ফর্টি ফোর পিপল। ইলেকশানে জিতে তুমি এই স্পেশাল ক্লাসের একজন হয়ে গেলে। পৌঁছে গেলে একেবারে পলিটিক্যাল পাওয়ারের সেন্ট্রাল পয়েন্টে। নাইকুন্ডুলে।'

তনিমা মন দিয়ে শুনছিল। বলল, 'বেশ, পৌঁছে গেলাম। তারপর?'

'হোল ইন্ডিয়ার বিজনেসম্যান, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর কনট্রাক্টররা মাছির মতো তোমাকে ছেঁকে ধরবে। এটা করে দাও, সেটা করে দাও।' বলতে বলতে ভুরু নাচাতে নাচাতে একটা ইঙ্গিত দিল দেবনাথ। 'দিল্লির বাতাসে একশো, পাঁচশো টাকা আর হাজার টাকার নোট লাখে লাখে উড়ছে। জাল ফেলে খালি ধরে নাও—'

দেবনাথ যে এত খবর রাখে, জানা ছিল না। অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তনিমা।

দেবনাথ থামে না, 'তারপর ধর, তোমার ভাগ্যে যদি শিকে ছেঁড়ে, পার্টি তোমায় পুরো না হোক তিন পোয়া মন্ত্রী বানিয়ে দিল। তখন তুমি রকেটের মতো কোন আশমানে গিয়ে পৌঁছবে ভাবতে পার?'

একটানা বকে বকে হাঁফ ধরে গিয়েছিল দেবনাথের। দম নেবার জন্য একটু থামে সে। তারপর ফের শুরু করে, 'পলিটিকসটা হল আজকের সবচেয়ে বড় বিজনেস। এক পয়সা ইনভেস্টমেন্ট নেই। লেবার ট্রাবল ফেস করতে হয় না। স্টাফকে স্যালারি, বোনাস দিতে হয় না। ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না। যে-সব পার্টি জনগণকে চমকে দিয়ে কিংবা তাদের নাকের ডগায় ঝুরি ঝুরি প্রতিশ্রুতির টোপ ঝুলিয়ে ভোট আদায় করতে জানে, তাদের একখানা টিকিট বাগিয়ে ইলেকশানে নামো। এম. পি হও, মন্ত্রী হও। ব্যস, তোমার ফোরটিন জেনারেশানের নবাবি স্টাইলে লাইফ কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ছুনুমুনু, পলিটকিসের চেয়ে এমন প্রফিটেবল কারবার ইন্ডিয়াতে আর একটাও নেই।' বলে মাথা নেড়ে, গলার স্বরে ঝাঁকি মারতে মারতে দারুণ মেজাজে এক কলি গেয়ে ওঠে, 'এমন সোনার দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—হুঁ—হুঁ—'

ফর্কে গেঁথে একটা ফিশ ফিঙ্গার মুখে পুরল তনিমা। চিবোতে চিবোতে দেবনাথের ভাবভঙ্গি লক্ষ করছিল। হালকা গলায় বলল, 'তুমি একটা ক্লাউন—'

টিপ্পনীটা গায়ে মাখল না দেবনাথ। তার ভেতর প্রবল উদ্দীপনা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বলতে লাগল, 'বিজনেসম্যান, ইন্ডস্ট্রিয়ালিস্টদের হাতে শুধু টাকা থাকে। আর এম. পি, এম. পিদের হাতে? টাকার সঙ্গে ক্ষমতা। ওয়ার্ল্ডে পলিটিক্যাল পাওয়ারই সবচেয়ে বড় পাওয়ার। এটাকে তুমি কাজে লাগাও। যা চাও, পেয়ে যাবে।'

ধন্দ কাটে না তনিমার। 'টাকা না হয় দিল্লিতে উড়ছে, কিন্তু আমি পাব কী করে?'

চোখমুখে চতুর হাসি ফুটিয়ে দেবনাথ গলার ভেতর থেকে বলে ওঠে, 'ডার্লিং, সবাই সব পারে না। যে পারে সে-ই পারে ফুল ফোটাতে। ওটা তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও—'

হাতের ভেতর পানপাত্র ঘোরাতে ঘোরাতে তনিমা বলে, 'তুমি কী বলতে চাও—সব এম. পি, মন্ত্রী টাকা বানানো ছাড়া আর কিছু ভাবে না?'

এতক্ষণে সামান্য চিন্তিত দেখায় দেবনাথকে। একটু চুপ করে থাকার পর বলে, 'দশ-বিশটা গাড়ল নিশ্চয়ই আছে। পুরনো লঝঝড় সেই ব্যাপারগুলো—কী যেন

বলে—সততা, আদর্শবাদ তাদের ঘাড়ে জিনের মতো চেপে বসে থাকে। এই সব সেকেলে ফসিলদের কথা মাথা থেকে বার করে দাও—'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর তনিমা বলল, 'একটা কথা আমি ভাবছি—'

'কী কথা?'

'যতই প্রোফেশনাল টিম দিয়ে ওরা সার্ভে করাক, ইলেকশানে আমার পক্ষে জেতা সম্ভব নয়। যদি হেরে যাই, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে মুখ দেখাতে পারব না। সিনেমা থেকে দুম করে পলিটিকসে গিয়ে ফেল মেরে বসলে পিপল দাঁত বার করে হাসবে। মিডিয়া এমনভাবে পেছনে লাগবে যে আমার কেরিয়ারের ক্ষতি হযে যাবে।'

'হুঁ—' নাকের ভেতর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটা শব্দ করল দেবনাথ। দুই হাতের বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে তনিমার দুশ্চিন্তা আর সংশয় উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কোনও শালা হারামি তোমার কিস্‌সু করতে পারবে না। যে পার্টি তোমাকে টিকিট দিচ্ছে সেটা রিজিওনাল কোনও দল নয়, অল ইন্ডিয়া পার্টি। তোমার কথামতো ধরেই নিলাম, ইলেকশানে হেরে গেলে। পার্লামেন্টে না যেতে পার, পার্টি ঠিক কায়দা করে তোমাকে রাজ্যসভায় পাঠাবে। রাজ্যসভার মেম্বার হয়েও কত লোক মিনিস্টার হচ্ছে জানো?'

তনিমা অবাক। 'আমাকে রাজ্যসভার মেম্বার করবে, তুমি কী করে জানলে?'

'ছুনুমুনু, সুবিমল রাহা, কৃষ্ণকিশোর তরফদাররা ঝানু পলিটিক্যাল লিডার। আমিও কম ঘুঘু নই। কত বছর সিনেমা লাইনে পড়ে আছি। খলিফা না হলে কি টিকে থাকতে পারতাম! তুমি তো জানো, হিন্দিতে একটা কথা আছে—নহলে পে ডহলে। নয়ের ওপর দশ। সুবিমলবাবুদের সঙ্গে আগেই আমার কথা হয়ে গেছে। হয় পার্লামেন্ট, নইলে রাজ্যসভা। এই কন্ডিশনে রাজি না হলে তুমি ইলেকশানে নামবে না।'

দেবনাথ যে অতীব ধুরন্ধর, তনিমার চাইতে কে আর বেশি জানে। সে যে তাকে না জানিয়ে তলে তলে আটঘাট বেঁধে এত সব কাণ্ড করে রেখেছে, ভাবা যায়নি। তনিমার বিস্ময় শতগুণ বেড়ে যায়।

দেবনাথ থামেনি, 'ওরা যখন তোমাকে কাজে লাগাতে চাইছে, আমরাই বা ছাড়ব কেন? ম্যাক্সিমামটা আদায় করে নেব। ইউ গিভ মি সামথিং, আই গিভ ইউ সামথিং —না কী বল?'

তনিমা জবাব দিল না।

দেবনাথ বলেই চলে, 'তোমার বয়েস কম, পলিটিকসের কোনও এক্সপিরিয়েন্স নেই। হট করে তোমাকে মিনিস্টার করবে না। কিন্তু তুমি ফিল্মের সুপারস্টার। হয়তো এন এফ ডি সি, বা ফিল্মস ডিভিসন কি চিলড্রেনস ফিল্মস সোসাইটির মাথায় বসিয়ে দিল। এরা ইন্ডিয়ার সব ল্যাঙ্গুয়েজে দেশের ফেমাস ডিরেক্টরদের দিয়ে ছবি করায়—'

তনিমা বলল, 'জানি। মনে পড়ছে, সাত আট বছর আগে এন এফ ডি সি'র একটা বাংলা ছবিতে হিরোইনের রোলটা করেছিলাম। কী যে নাম ফিল্মটার? ও হ্যাঁ, 'নির্জন শিখরে'।'

দেবনাথের গেলাস ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বোতল থেকে হুইস্কি ঢেলে বরফের টুকরো মেশাতে মেশাতে বলল, 'মিডিয়া কাছা খুলে তোমার অ্যাক্টিংয়ের প্রশংসা করেছিল। তাসখন্দ না হংকং, কোথাকার ফেটিভ্যালে যেন বেস্ট অ্যাকট্রেসের অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিলে।'

'তা পেয়েছিলাম।' বিস্বাদ মুখে তনিমা বলে, 'কিন্তু ফিল্মটার ডিরেক্টর ইনডোর-আউটডোর মিলিয়ে চল্লিশ দিন খাটিয়ে আমাকে রেমুনারেশন দিয়েছিল ওনলি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড। তখন পার পিকচারে আমি পেতাম মিনিমাম তিন লাখ। তার ওপর কত বায়নাক্কা। তার ছবির শুটিং যখন চলবে তখন অন্য কারও ছবিতে ডেট দিতে পারব না।'

দেবনাথ হাসে, 'এই টাইপের ডিরেক্টরদের অন্য কাউকে পয়সা দিতে বুক ফেটে যায়। ছবির জন্যে ফিনান্স তো কম পায় না। তার প্রায় পুরোটাই নিজেদের গর্ভে ঢোকায়।'

'এরা সমস্ত কিছু পারে। স্টোরি, স্ক্রিপ্ট, মিউজিক থেকে শুরু করে আর্ট ডিরেকশন—এ টু জেড। বোলচাল শুনলে মনে হয়, সবাই কুরোসোয়া, গদার, ডি সিকা, অ্যান্টোনিওনি কি সত্যজিতের জ্যাঠামশাই।'

'তবু যদি এদের ছবি দেশের লোক দেখত! হল-এ রিলিজ করলে তিন দিনে উঠে যায়। সে যাক গে, তুমি যখন গভর্নমেন্টের ওই অর্গানাইজেশনগুলোর মাথায় গিয়ে বসবে, শুধু বেঙ্গল না, হোল ইন্ডিয়া থেকে ডিরেক্টর, প্রোডিউসাররা তোমার দরজায় লাইন দিয়ে পড়ে থাকবে। কর্পোরেশন বল, আর সোসাইটিই বল—প্রত্যেকটার অ্যানুয়াল বাজেট কত জানো? ক্রোরস। কলকাতার টিমটিমে ভিখিরি-মার্কা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বসে তুমি তা ইমাজিন করতে পারবে না।'

তনিমা উত্তর দিল না।

দেবনাথ বলল, 'একবার তুমি দিল্লিতে গিয়ে বোসো। তারপর—'

'তারপর কী?'

'ফুল ফোটাবার পুরো দায়িত্বটা আমার।'

লোকটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত খবর যে রাখে! শুনতে শুনতে হাঁ হয়ে যাচ্ছিল তনিমা। একটু হেসে বলল, 'ঠিক আছে, আগে তো দিল্লি যাই, তারপর ফুল ফুটিও।'

মার্চের রাত বাড়তে থাকে। আউটডোর শুটিংয়ে গেলে, কি পার্টি টার্টিতে থাকলে অনিয়ম হয়ে যায়। সময় ঠিক থাকে না। কিন্তু বাইরে না বেরুলে কাঁটায় কাঁটায় দশটায় তনিমারা ডিনারে বসে যায়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে মিনিট চল্লিশ। তারপর বি বি সি, কি সি এন এন-এর নিউজ শোনা, কিছুক্ষণ লাফিয়ে লাফিয়ে এ-চ্যানেল সে-চ্যানেলে হিন্দি কি হলিউডের পুরনো কোনও ক্লাসিক পেলে দেখা। নইলে রগরগে পার্নোমার্কা মিড নাইটের অ্যাডাল্ট ফিল্ম, দু-চার মিনিট পর পরই তাতে থাকে শয্যাদৃশ্য। দেবনাথ দারুণ করিৎকর্মা। তনিমার এক মাড়োয়ারি প্রডিউসার পর্নোগ্রাফির ব্যাপারে গভীর জ্ঞানী ব্যক্তি। একেবারে শাহেন শা লোক। ব্যবসার কাজে তাকে দুনিয়া চষে বেড়াতে হয়। 'জগৎ ভ্রমিয়া' জহুরির মতো বেছে বেছে পর্নো ম্যাগাজিন, উলঙ্গ যুবতীদের ছবির অ্যালবাম আর ব্লু ফিল্মের কাসেট জোগাড় করে আনে। যতবার বিদেশ ভ্রমণ ততবার এইসব ম্যাগাজিন, অ্যালবাম আর ফিল্ম। তার সংগ্রহশালাটি হয়তো কোনও দিন জাতীয় সংগ্রহশালার মর্যাদা পেয়ে যাবে। এই প্রডিউসারটির কাছ থেকে মাঝে মাঝে ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট চেয়ে আনে দেবনাথ। সেগুলো পেলে নিউজ কি হলিউডের ক্লাসিক শিকেয় তুলে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে তনিমাকে ঘন করে গায়ে জড়িয়ে বসে পড়ে সে।

সাড়ে ন'টায় ড্রিংকের পর্ব শেষ হল। প্রচুর টেনেছে দেবনাথ। অন্যদিন পাঁচ-ছ পেগের পর দাঁড়ি টানে। আজ এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। মেজাজ তর হয়ে আছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়েছে হুইস্কির মাত্রা। দশ দশ পেগ তার পাকস্থলীতে চালান হয়ে গেছে। লাল চোখ ঢুলু ঢুলু, মাথা অল্প অল্প দুলছে। জড়ানো গলায় এক আধ কলি গেয়ে উঠছে,'কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ' —নেশা চড়লে, কিংবা প্রাণে ফুর্তি চাগিয়ে উঠলে পুরাতনী গানের এই লাইনটা সে গেয়ে ওঠে। কোনও কার্যকারণ নেই, পুরোপুরি খাপছাড়া, তবু কেন যে এটা গায় কে জানে। মাতালের প্রলাপ হয়তো।

তনিমা আধ পেগ আধ পেগ করে দু'বার নিয়ে তাতে প্রচুর বরফের টুকরো মিশিয়েছে। সব মিলিয়ে এক পেগে আর কতটুকু নেশা হয়! স্নায়ুগুলো সামান্য চনমনে হয়ে ওঠে, এই আর কি।

তনিমা উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আমি বাথরুমে যাচ্ছি। তুমিও রেডি হয়ে নাও। ডিনারের টাইম হয়ে এসেছে।'

রাতের খাবারের আগে শীতগ্রীষ্ম বারোমাস স্নান করে তনিমা। গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা জলে, শীতে গিজার চালিয়ে জল গরম করে নেয়।

আজ এত তাড়াতাড়ি হুইস্কির বোতল ছেড়ে ওঠার ইচ্ছা ছিল না দেবনাথের। ভেবেছিল গলা অব্দি বোঝাই করে ফেলবে। আচমকা কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ছুনুমুনু, আগরওয়ালের কাছ থেকে লাস্ট উইকে যে ব্লু ফিল্মের ক্যাসেটটা এনেছিলাম সেটা দেখা হয়নি। আজ জম্পেশ করে দেখব—'

লেশমাত্র আগ্রহ দেখাল না তনিমা। সোজা বেডরুমে গিয়ে অ্যাটাচড বাথে ঢুকে পড়ল।

মার্চ মাস পড়লেও এখনও রাতের দিকে শীতের হালকা একটা আমেজ থাকে। সিজন চেঞ্জের সময়। রাত্তিরে ঠান্ডা জলে চান করলে গলা ব্যথা করে, জ্বর মতো হয়। তাই জলটা সামান্য গরম করে নেয়।

স্নান সেরে কিমেনো ধরনের পাতলা সিল্কের রাতপোশাক পরে, গলায় হালকা পাউডার, ঠোঁটে ক্রিম ঘষে, চুল আঁচড়ে ডাইনিং টেবলে চলে এল তনিমা। লিভিং রুমের একধারে খাওয়ার ব্যবস্থা।

রাতটা বেশির ভাগ দিন একসঙ্গে কাটালেও তনিমা আর দেবনাথের আলাদা আলাদা বেডরুম। নিজের ঘর থেকে স্নানটান সেরে দেবনাথও ততক্ষণে চলে এসেছে। তার পরনে ডোরাকাটা, ঢোলা স্লিপিং স্যুট।

শিবু এবং অন্য একটা কাজের লোক মধু, দু'জনে সার্ভ করতে লাগল। 'স্কাইলার্ক' থেকে বিরিয়ানি আর মাটন চাঁপ দিয়ে গিয়েছিল। শিবুরা বাড়িতে স্যালাড বানিয়েছে। সেই সঙ্গে পুডিং। আইসক্রিমও আছে। আছে নলেন গুড়ের সন্দেশ আর ক্ষীরের পানতুয়া।

মিষ্টিটা পারতপক্ষে ছোঁয় না তনিমা। সন্দেশ পানতুয়া ফ্যাট বাড়ায়। আইসক্রিমও তাই। তার ওপর ওতে থাকে প্রচুর ক্যালরি। শরীর বেঢপ মোটা হয়ে গেলে প্রডিউসাররা ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না। মিষ্টিটিষ্টি ছোঁয়া তো বটেই, চোখে দেখাও বারণ। কিন্তু আজ কী যে হল, চামচে পুডিং কেটে একটা টুকরো মুখে পুরল।

খাওয়া শেষ হলে দু'জনে চলে এল তনিমার বেডরুমে। এই ঘরের ডান পাশের দেওয়ালের মাঝখানে একটা দরজা। সেটার ওধারের ঘরটাই দেবনাথের বেডরুম। দিনরাত দরজাটা খোলা থাকে।

বিছানায় বসে কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা হল। সেই পুরনো কাসুন্দি। তনিমার ইলেকশানে নামা। এম. পি, টেম. পি হতে পারলে তো একটা অবিশ্বাস্য স্বপ্নের চুড়োয় পৌঁছে যাওয়া, না পারলেও পার্টির কাছ থেকে কিভাবে কতটা সুযোগ সুবিধা আদায় করা যায় সেটা আগেভাগেই ঠিক করে ফেলা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কথার মাঝখানে ঝট করে উঠে দাঁড়ায় দেবনাথ। তার আর তর সইছিল না। মাঝখানের দরজা দিয়ে পাশের বেডরুম থেকে আগরওয়ালের সেই নিষিদ্ধ ক্যাসটটা নিয়ে এল।

তনিমা দেবনাথকে লক্ষ করছিল। তরল গলায় বলল, 'জনগণের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে পার্লামেন্টে যাবার জন্যে টিকেট পেতে চলেছি। পাপারাজিরা কে কোথায় শিকার ধরার জন্যে ওত পেতে থাকে, বোঝা যায় না। একবার যদি ওরা টের পায়, ফিউচারের এম. পি তার পার্টনারের সঙ্গে বসে বসে ব্লু ফিল্ম দেখছে, মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়বে। তোমাকে আর আমাকে নিয়ে আগেও কাগজে টাগজে বেশ কিছু কেচ্ছা বেরিয়েছিল। কিন্তু এবার স্ক্যান্ডালের বান ডেকে যাবে। সুবিমলবাবুদের কথা না হয় বাদই দিলাম, ভোটারদের কাছে কি মুখ দেখাতে পারব? কলকাতা ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে।'

দেবনাথ মুখ বাঁকিয়ে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'বেডরুমে বসে এত রাতে দেখি। পাপারাজিরা কেন, ভগবানেরও সাধ্যি নেই টের পায়—' সে ঘরের কোণে টিভি সেটটার কাছে চলে যায়। ভি সি আরে ক্যাসেটটা পুরে চালিয়ে দিয়ে ফিরে এসে তনিমার গা ঘেঁষে বসে পড়ে।

মাতাল-করা মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে টিভির পর্দায় দৃশ্যের পর দৃশ্য ফুটে উঠতে থাকে। এটা একটা জাপানি ছবি। কোনও বেডরুম টুমে নয়, একেবারে উদোম প্রকৃতির মাঝখানে—চারপাশে উঁচু উঁচু সব গাছ, অজস্র চেরিফুল, মাথার ওপর বিশাল নীলাকাশ—এক যুবক এবং যুবতী সবুজ ঘাসের ওপর বসে প্রথমে গল্প করছিল। একসময় যুবকটির হাত ধীরে ধীরে উঠে এল তরুণীটির কাঁধে। তাকে টেনে নিয়ে নিজের গায়ে ঘন করে লেপটে নিল। তারপর ঠোঁটে কপালে চিবুকে গালে চুমুর পর চুমু। ততক্ষণে মেয়েটির শরীর তেতে ওঠে। একটা চুমুর বদলে সে ফিরিয়ে দেয় দশটা। এভাবে চলল কিছুক্ষণ। তারপর একজন আরেক জনের পোশাক একে একে খুলে ফেলে। দু'টি উলঙ্গ শরীর। যেন নিখুঁত ভাস্কর্য। হালকা রঙের হলুদ পাথরে তৈরি। খোলা আকাশের নিচে তারা ক্রমশ আদিম খেলায় মেতে উঠতে থাকে।

এদিকে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিজিউক তীব্র হয়ে উঠেছে। টিভির পর্দার নানা দৃশ্য এবং সুরের রিদম থেকে তনিমার বেডরুমে আগুনের হলকা ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে।

দশ ফিট দূরে বসে একটি পুরুষ এবং একটি রমণীর চোখ টিভিতে আটকে গেছে। ব্লু ফিল্ম তারা প্রায়ই দেখে থাকে। এটা নতুন কিছু নয়। এইসব ফিল্মের বিষয় এক। শুধু নায়ক-নায়িকা আলাদা। কখনও আমেরিকান, কখনও সুইস, কখনও বা ব্রাজিলিয়ান। খালি ফোরেনই নয়, খাঁটি স্বদেশিও আছে। গোয়ান পিক্রু, বাঙালি, তামিল ইত্যাদি। যতবার তনিমারা দেখে , ওই সব দৃশ্য এবং মিউজিক তাদের স্নায়ুতে ঢুকে গিয়ে সেক্সকে চাগিয়ে তোলে।

দেবনাথ গলার ভেতর অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ করছিল। অনেকটা শীৎকারের মতো। এই লোকটা পঞ্চাশ পেরুতে চলল। কিন্তু শরীর জুড়ে এখনও শুধু খাই খাই। তনিমা তো আছেই। তার নজর এড়িয়ে কোনও যুবতীকে বাগে পেলেই হল। সে ঝাঁপিয়ে পড়বেই।

তনিমা টের পাচ্ছিল, তার চোখমুখ থেকে ভাপ বেরিয়ে আসছে। পা থেকে তালু অব্দি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। চাপা গলায় আচ্ছন্নের মতো সে বলে ওঠে, 'জাপানি ছুকরিগুলো পারেও।'

এতক্ষণ দম বন্ধ করে ফিল্মটা দেখছিল দেবনাথ। চকিতে তার চোখ তনিমার দিকে ঘুরে যায়। দেবনাথের ভেতর একটা যৌনকাতর, ক্ষুধার্ত চিতা সারাক্ষণ আধো ঘুমে, আধো জাগরণে ঝিম মেরে থাকে। সেটা এখন পুরোপুরি জেগে উঠেছে। আচমকা শরীরটাকে স্প্রিংয়ের মতো ছুড়ে দিয়ে তনিমাকে দু'হাতে সাপটে ধরে। বলে, 'ছুনুমুনু, তুমি ওদের নাক কেটে দিতে পার। কাম অন—'

ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ভান করে তনিমা।—'এই, এই—টিভিটা চলছে—'

'চলুক—'

তিন

কখন মাঝরাত পার হয়ে গেছে, টের পাওয়া যায়নি।

ঘুম আসছিল না তনিমার। ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে। রাতপোশাকের কোমরের ফিতেটা খুলে ঝুলছিল, সেটা গেরো দিয়ে বেঁধে বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে অনেকক্ষণ জল ছিটাল। হাত-পা ভালো করে ধুয়ে নিল। ঠান্ডা জল তার ত্বকে আরাম ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

তোয়ালে দিয়ে মুখটুখ মুছে বাইরে এসে একবার বিছানার দিকে তাকাল তনিমা। অন্য দিন তার সঙ্গে দু-তিন ঘণ্টা কাটিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় কিন্তু

আজ এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে দেবনাথ। থামের মতো লোমশ দুই উরু দু-দিকে ছেতরে আছে। ঘুমোলে মুখটা আধাআধি হাঁ হয়ে থাকে। বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ করে নাক ডাকে তার। গালের কশ বেয়ে লাল গড়ায়।

দেবনাথকে দেখতে দেখতে বিবমিষা হচ্ছিল তনিমার। মনে হল পেটে যে খাদ্যবস্তুগুলো এখনও পুরোপুরি হজম হয়নি, গলনালী দিয়ে হড়হড় করে বেরিয়ে আসবে। নাকমুখ কুঁচকে যাচ্ছিল তার। ওই লোকটাকে ঘৃণা করে সে। নিদারুণ ঘৃণা। আবার ওর ওপর ভরসা না করেও উপায় নেই। সেই পুরনো কথাটা মনে পড়ে গেল। ঘেন্না আর প্রচন্ড বিতৃষ্ণার অদৃশ্য শৃঙ্খল যেন তাদের এক সঙ্গে আটকে রেখেছে। বাকি জীবন হয়তো এইভাবেই কাটিয়ে যেতে হবে।

ওই লোকটার পাশে এই মুহূর্তে আর শুতে ইচ্ছা করছিল না তনিমার। মুখ ফিরিয়ে ত্বরিত পায়ে শিয়রের দিকের দেওয়ালের পাশে চলে আসে সে। গোটা দেওয়ালটা জুড়ে কাচের জানালা। জানালাগুলো খোলা। বিশাল মহানগর এই মুহূর্তে গাঢ় ঘুমে তলিয়ে আছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। সব নিঝুম। অসাড়। নির্জন রাস্তায় ক্বচিৎ দু-একটা প্রাইভেট কার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল। কর্পোরেশনের ভেপার ল্যাম্পগুলো অকাতরে আলো বিতরণ করে চলেছে। দেড়শো ফিট নিচে একপাল বেওয়ারিশ কুকুর ক্লাসিক্যাল গানের জলসা বসিয়ে দিয়েছে। তাদের গলার স্বর বায়ুস্তর ভেদ করে ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে। তনিমার কান অব্দি প্রায় পৌছচ্ছেই না।

আকাশে পূর্ণ চাঁদের মায়া। দোলের বোধহয় আর বেশি দেরি নেই। কারা যেন জাদুকলস উপুড় করে অবরিল গলানো রুপো ঢেলে দিচ্ছে। যেদিকে তাকানো যাক, নীলাকাশে স্বচ্ছ স্ফটিকের দানার মতো অজস্র তারার মেলা।

কোনও কোনও দিন রাতে ঘুম না এলে ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো এই জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় তনিমা। তখন অলৌকিক কোনও টাইম মেশিন তাকে তুলে নিয়ে উত্তর বাংলার একটা শহরে টেনে নিয়ে যায়।

আজ কিন্তু প্রথম দিকে সেরকম কিছু ঘটল না। সুবিমল রাহা, কৃষ্ণকিশোর তরফদার, ইলেকশান, প্রোফেশনাল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট— টুকরো টুকরো, বিচ্ছিন্নভাবে এ-সব চোখের সামনে ফুটে উঠেই লহমায় মিলিয়ে যেতে লাগল।

তারপর স্মৃতির কোনও গোপন কুঠুরিতে অদৃশ্য ভিডিও 'অন' হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সতেরো আঠারো বছর আগের ছবি ভেসে আসতে শুরু করল। একের পর এক। পরিষ্কার সব চিত্র। এতকাল বাদেও এতটুকু ঝাপসা হয়নি।

আটাগুড়ি উত্তর বাংলার মাঝারি মাপের একটা শহর। তনিমার ছেলেবেলায় সেটা ছিল খুবই শান্ত, নিরিবিলি। বাংলো ধরনের বাড়িই বেশি। তবে দোতলা তেতলা দালানকোঠাও চোখে পড়ত। চারদিকে অজস্র গাছ। দেবদারু, পাইনই বেশি। তাছাড়া রেন-ট্রির ছড়াছড়ি। কত রকমের মরসুমি ফুল যে ফুটত! প্রতিটি সিজনে শহর জুড়ে শুধু রঙের প্লাবন।

পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ি নদী হলুদ, বাদামি, কালচে, মেরুন রঙের, নানা শেপের যেমন গোল, চৌকো, তেকোনা, নুড়ি আর পাথরের ওপর দিয়ে গজরাতে গজরাতে বয়ে যেত।

দু'দিকে তিন চারশো ফিট চওড়া সোনালি বালির পাড়।

নদীর ওধারে পাড় ছাড়ালেই কত যে উঁচু নিচু পাহাড়। কোনওটা মাথায় খাটো, কোনওটার চুড়ো আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। পাহাড়গুলোর ঢালে লাইন দিয়ে চায়ের বাগান। তারই ফাঁকে কোথাও কোথাও প্রাচীন সব মহাবৃক্ষ ডালপালা মেলে আবহমান কাল রোদ বৃষ্টি থেকে এনার্জি শুষে নিয়ে অনড় দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। মহাশূন্যে রঙের ফোয়ারা ছুটিয়ে তারা উড়তেই থাকে। উড়তেই থাকে। এছাড়া খানিক পর পর একটা করে ঝরনা। পাহাড়ের কোনও গোপন খাঁজ থেকে তোড়ে বেরিয়ে এসে নিচের নদীতে ঝরেই চলেছে। অবিশ্রাম গম গম আওয়াজ তুলে। তার প্রতিধ্বনি দু'ধারের পাহাড়ের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে দশ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।

আটাগুড়ি স্বর্ণলতা গার্লস হাইস্কুলের সিনিয়র টিচার ছিলেন মণিভূষণ লাহিড়ি। তনিমার বাবা। ওই এলাকার একজন বিরাট টি-প্ল্যান্টার সুশীতল বর্মন তাঁর মা স্বর্ণলতার নামে বহুকাল আগে স্কুলটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস যতদিন স্কুলটা আছে, তাঁর মায়ের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

মণিভূষণরা চার পাঁচ পুরুষ ধরে আটাগুড়ির বাসিন্দা। শহরের পুরনো পাড়ায় অনেকটা জায়গার মাঝখানে তাঁদের সেকেলে ধাঁচের বাড়ি। সব মিলিয়ে খানপাঁচেক ঘর। পাকা মেঝে, ইটের দেওয়া, মাথায় টালির চাল। উঠোনটাও শান-বাঁধানো। সেটার একধারে কুয়ো, রান্নাঘর, চানের ঘর ইত্যাদি।

সেই আমলে স্কুল টিচারদের মাইনে-টাইনে এখনকার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এতটা বাড়েনি। এদিকে সংসারে অনেকগুলো মানুষ। বিধবা মা, স্ত্রী, চার ছেলেমেয়ে এবং এক বাপ-মা-মরা অনাথ ভাইপো। তাই সকাল-সন্ধে প্রচুর টুইশনি করতে হত মণিভূষণকে। স্কুলের মাইনের সঙ্গে টুইশনির টাকা জুড়ে টায়টোয় কোনও রকমে চলে যেত।

ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড় তনিমা। সেদিনের গৌরী। সবাই বলত, তার মতো সুন্দর মেয়ে আটাগুড়িতে আর একটিও নেই। এদেরই কেউ কেউ আরও একটু রং চড়িয়ে দিত। বলত—পরী।

সেদিনের আটাগুড়ির মানুষজন ছিল বেশ ভদ্র। ইতরামো, অসভ্যতা করার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। তা ছাড়া সবাই চেনাজানা। তনিমা যখন কিশোরী, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরতে চলেছে, বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় বেরুলে, কিংবা স্কুলে যাতায়াতের সময়, অনেকেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু মাস্টার মশাইয়ের মেয়েকে কেউ কখনও উত্যক্ত করেনি। মণিভূষণ ছিলেন আটাগুড়ির একজন সৎ নাগরিক। শিক্ষক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম। মানুষ হিসেবেও লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। স্বভাবে কোনও রকম ছলচাতুরি ছিল না। চালবাজি আদৌ পছন্দ করতেন না। সংসারের নিত্য অনটনের মধ্যেও বিপদে আপদে লোকের পাশে দাঁড়াতেন, সাধ্যমতো সাহায্যও করতেন। প্রাইভেট টুইশনি না করে উপায় ছিল না। তবু গরিব ছাত্রদের ছুটির দিনে বাড়িতে ডেকে ঘণ্টাখানেক বিনা পয়সায় পড়িয়ে দিতেন। বাবার সামাজিক মর্যাদা ছিল তনিমার রক্ষাকবচ। শহরের মানুষ যতই ভালো হোক, আটাগুড়ি তো পুরোপুরি স্বর্গরাজ্য নয়। দু-চারটে পাজি, বজ্জাত ছোকরা কি ছিল না? কিন্তু তারা জানত, বেশি বাড়াবাড়ি করলে পার পাওয়া যাবে না।

মণিভূষণের খুব বড় মাপের উচ্চাশা ছিল না। তাঁর যতটুকু রোজগার তার মধ্যেই মোটামুটি ভদ্রভাবে মানিয়ে গুছিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলেই তিনি খুশি। তবে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দিকে তাঁর কড়া নজর ছিল। সবাইকে অন্তত বি. এ'টা পাস করতে হবে। তারপর মেয়েদের সৎপাত্র দেখে বিয়ে দেবেন। তারা ভালোভাবে খেয়ে পরে শ্বশুরবাড়িতে গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদেব. মতো সংসারধর্ম পালন করুক, এর বেশি কিছু কাম্য ছিল না তাঁর । দুই ছেলে এবং ভাইপোর ভবিষ্যৎও আগাম ঠিক করে রেখেছিলেন। আটাগুড়ির দু-তিনটে বড় টি প্ল্যান্টারের বাড়ি গিয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। ওঁরা কথা দিয়েছিলেন, তাঁর ভাইপো আর দুই ছেলে কলেজ থেকে বেরুলেই চা-বাগানে চাকরি পেয়ে যাবে। সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত। এ-নিয়ে মণিভূষণের আদৌ দুশ্চিন্তা নেই। তিনি ছিলেন একজন সুখী মানুষ। পুরোপুরি উদ্বেগশূন্য।

কিন্তু বাবার তৈরি ছকের ভেতর নিজের জীবনকে কাটাছাঁট করে ঢুকিয়ে দেবার কথা ভাবতেই পারত না তনিমা। আর দশটি মেয়ের মতো খানিকটা লেখাপড়া শিখে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসা, কেরানি কি ছোট মাপের অফিসার বা বিজনেসম্যানের গলায় মালা দিয়ে যদিদং হৃদয়ং মম ইত্যাদি আউড়ে বাসরঘর,

পরের দিন বাসি বিয়ে চুকিয়ে কোরাসে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি সেরে বরের পিছু পিছু গাড়িতে ওঠা, তারপর শ্বশুরবাড়ি, স্বামী সেবা, উঠতে বসতে শাশুড়ি আর ননদের ধাতানি, কপাল খারাপ হলে রান্নাঘরে দিনের পাঁচ ছ'ঘণ্টা কাটিয়ে হাড় কালি করা, রাত্তিরে নিয়মিত মৈথুন, কয়েক বছরের মধ্যে তিন চারটে ছেলেময়ের জন্ম দিয়ে অকালে বুড়িয়ে যাওয়া, চল্লিশ পেরুতে না পেরুতেই মাথার চুলে সাদা ছোপ, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরুনো, তলপেটে চিরস্থায়ী কোনও রোগ, অনিদ্রা, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা অসুখবিসুখ নিয়ে সারাক্ষণ টেনশন—এই ধরনের ফরমুলায় বাঁধা, ম্যাড়মেড়ে, উত্তেজনাহীন জীবনে পা রাখার কথা ভাবতেই পারত না তনিমা।

'পরীর মতো সুন্দর'— এই বাক্যটি ছেলেবেলা থেকে শুনতে শুনতে তার মাথায় ফিক্সেশানের মতো আটকে গিয়েছিল। পরে তার সঙ্গে যোগ হল—সিনেমা আর টিভি। সিনেমার ম্যাগাজিন হাতে এলেই গোগ্রাসে গিলতে থাকত। মীনাকুমারী নার্গিস মধুবালা থেকে বৈজন্তীমালা সুচিত্রা সেন জিনৎ পারভিন বাবি, শাবানা থেকে সুপ্রিয়া জয়াপ্রদা—মায়াকাননের এই পরীদের ঝকঝকে ছবির পাশাপাশি নিজের কোনও ছবি রেখে তাকিয়ে থাকত পলকহীন। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত তার। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। ওই মহানায়িকাদের চেয়ে সে তিলমাত্র কম সুন্দর নয়। শুধু সিনেমা ম্যাগাজিনই নয়, আটাগুড়িতে দু দু'টো সিনেমা হলও ছিল। একটায় দেখানো হত বাংলা ছবি, একটায় হিন্দি। টিফিনের পয়সা জমিয়ে দু-চারজন বন্ধু জুটিয়ে স্কুল পালিয়ে সেখানে চলে যেত তনিমা। নতুন ছবি হলে তো কথাই নেই। পুরনো ভালো ছবি হলে পাঁচ সাত বারও দেখে আসত।

তনিমাদের ফ্রিজ ছিল না। টিভি ছিল না। ওয়াশিং মেশিন বা মাইক্রো ওভেনও নয়। কিন্তু তার বন্ধু স্বপ্নাদের বাড়িতে সব ছিল। স্বপ্নার বাবা নাম-করা ডাক্তার। বিপুল পসার তাঁর, অঢেল পয়সা।

প্রায়ই স্বপ্নাদের বাড়ি টিভি দেখতে যেত তনিমা। ওদের তিনশো লিটারের দামি ফ্রিজ। মাছ মাংস এবং নানা সুখাদ্যে আর সফট ড্রিংকে বোঝাই। রঙিন টিভির পঁচিশ ইঞ্চি স্ক্রিন থেকে ফিল্ম টেলিফিল্ম সিরিয়াল, এমনকি চোখধাঁধানো অ্যাডগুলো থেকে আশ্চর্য সব স্বপ্ন ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে এসে তনিমার মস্তিষ্কে ঢুকে যেত। তারা থাকে টালির চালের আদ্যিকালের বাড়িতে যার পলেস্তারা খসে জায়গায় জায়গায় ইটের কাঠামো বেরিয়ে পড়েছে। ঘুমোয় নড়বড়ে তক্তপোশে, তেলচিটে বিছানায়। বেশির ভাগ বালিশ বা লেপ তোশক ফেটে তুলো উড়ছে। দু'বেলা ভরপেট খেতে পায় ঠিকই, তবে রোজ মাছ নয়, মাংস ক্বচিৎ কখনও। পোশাক বলতে সস্তা সালোয়ার কামিজ। বিয়েবাড়ি টাড়ি যাবার জন্য দু-একটা

খেলো সিল্কের শাড়ি, তাও কতকাল আগের কেনা। সাজের জিনিস বলতে কাজল, পাউডার আর ক্রিমের একটা শিশি।

আর সিনেমা এবং টিভির ওই পরমাশ্চর্য নায়ক নায়িকারা? তারা থাকে রাজপ্রাসাদের মতো জমকালো সব বাড়িতে। ঘরে ঘরে এয়ার-কন্ডিশনার, পায়ের তলায় ছ'ইঞ্চি পুরু কার্পেট। তারা ঘুমোয় তিন ফুট গদিওলা ধবধবে বিছানায়। দুগ্ধফেননিভ বলে একটা কথা আছে, ঠিক তেমনটি। তারা খেতে বসে ঝাড়লণ্ঠনের তলায় বিশাল ডাইনিং টেবলে। রুপোর কারুকাজ-করা অগুনতি পাত্রে বোঝাই থাকে পৃথিবীর সেরা সেরা সব খাবার। নক্ষত্রলোকের এই বাসিন্দাদের পরনে মহার্ঘ সব পোশাক। এদের বাড়ির কমপাউন্ডে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকে মার্সেডিজ কি রোলস রয়েস। কথায় কথায় তারা প্লেনে চড়ে উড়ে যায় মহাবিশ্বের নানা দিগন্তে—টোকিও বা লন্ডনে, মরিশাস কি নিউ ইয়র্কে। কত টাকা এদের, কী অঢেল সুখ, যা খুশি করার অবাধ স্বাধীনতা।

মণিভূষণ স্বপ্নদর্শী ছিলেন না। একজন মধ্যবিত্ত ভালোমানুষ চিরকালের ছক-বাঁধা নিয়মে যেভাবে জীবন কাটিয়ে দেয় তার বাইরে একটা পাও ফেলার কথা তিনি ভাবতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর মেয়েটি একেবারে আলাদা গোত্রের। সিনেমার গ্ল্যামার তাকে দিনে দিনে গিলে ফেলছিল। তার স্বপ্নের সীমা-পরিসীমা নেই। দশটা মহাকাশ জুড়লে তনিমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধরতে পারবে না, সেটা এমনই বিপুল। তার অজস্র টাকা চাই, চাই অফুরান খ্যাতি, সিনেমার মহানায়িকাদের মতো সারাক্ষণ সে থাকতে চায় প্রচারের আলোয়। মিডিয়ার লোকেরা উন্মাদের মতো তার পেছনে দৌড়চ্ছে, পঞ্চাশটা ক্যামরায় শব্দ হচ্ছে ক্লিক ক্লিক, ঝকমকে ম্যাগাজিনগুলোর কভারে তার ছবি বেরুচ্ছে, টিভি'র পর্দায় অনবরত দেখা যাচ্ছে তার মুখ, তার কোনও ফিল্ম রিলিজ হলে দেড় কিলোমিটার লম্বা লাইন পড়ে যাচ্ছে, পঁচিশ টাকার টিকিট ব্ল্যাকাররা বেচছে পঞ্চাশ টাকায়—এমন সব টুকরো টুকরো কোলাজ তার চোখের সামনে ফুটে উঠত। সারাক্ষণ ঘোরের মধ্যে থাকত তনিমা। মনে হত, পৃথিবীর শক্ত মাটি থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে রঙিন বায়ুস্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউ তার দুই কাঁধে বুঝিবা ডানা জুড়ে দিয়েছে।

টাকা চাই, নাম চাই। চাই এটা সেটা এবং আরও কত কী। চাওয়ার শেষ নেই। কিন্তু সিনোমার সুপারস্টার না হতে পারলে এ-সব পাচ্ছে কোথায়? আটগুড়ির মতো উত্তরবঙ্গের অতি তুচ্ছ, বিবর্ণ শহরের এক স্কুলমাস্টারের মেয়ের পক্ষে সিনেমায় নামার সুযোগ মিলবে কী করে? ফিল্ম তৈরি হয় সুদূর কলকাতায়, আরও দূরের বোম্বাই কি মাদ্রাজে। একা একা অচেনা সেই সব শহরে তনিমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।

সেই কিশোরী-বয়স থেকে যে স্বপ্নটা তার মধ্যে ডালপালা ছড়াচ্ছিল, একদিন শুকিয়ে মরে ঝরে হয়তো শেষ হয়ে যেত। তারপর চিরাচরিত সেই বিয়ে ঘরকন্না স্বামী শ্বশুর ছেলেমেয়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবনের যে সাইকেল অনন্তকাল ঘুরে চলেছে তার ভেতর ঢুকে পড়া। আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর মডেলে নিজেকে তৈরি করে নেওয়া। এবং..এবং...

কিন্তু রূপকথার বুঝিবা লয় ক্ষয় নেই। লক্ষ কোটি মানুষের ভেতর থেকে তনিমাকে বেছে নিয়ে সেটা অতর্কিতে সামনে এসে দাঁড়াল।

তখন আটাগুড়ি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজে সে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। সিনেমার পোকা মাথায় কামড় বসালেও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেছিল। মাধ্যমিকে স্টার, গোটা চারেক লেটার নিয়ে। হায়ার সেকেন্ডারিতে আট নম্বরের জন্য স্টারটা ফসকে গেছে। তবে লেটার পেয়েছিল দু'টো।

এতকাল টালিগঞ্জের ফিল্মওলারা পুরি দীঘা নৈনিতাল কি শিলংয়ে গিয়ে আউটডোর শুটিং করেছে। এবার তাদের নজর এসে পড়েছিল নর্থ বেঙ্গলে। একদিন হই হই করে কলকাতা থেকে বাংলা ফিল্মের একটা পার্টি আটাগুড়িতে এসে হাজির হল। ডিরেক্টর, অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, অন্য সব টেকনিশিয়ান, হিরো, হিরোইন, ক্যারেক্টার আর্টিস্ট—সমস্ত মিলিয়ে বিরাট এক বাহিনী। তাদের সঙ্গে প্রচুর লটবহর। আটাগুড়ির একমাত্র নাম-করা হোটেল 'গ্রিন ভিউ হোটেল'টা তিন সপ্তাহের জন্য তারা পুরোটা 'বুক' করে ফেলল। উদ্দেশ্য এখানকার পাহাড়, ঝরনা আর টি গার্ডেনগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই পাহাড়ি নদীটার পাড়ে তারা শুটিং করবে। আরও অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর লোকেশনও বেছে নিল। সেই সব জায়গাতেও শুটিং হবে। তবে পাহাড়ি নদীটাই আসল স্পট।

আটাগুড়িতে সিনেমার দলটা আচমকা এসে পড়ায় একটি উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণীর জীবন পুরোপুরি ওলট পালট হয়ে গেল। রক্তের ভেতর সে যে কী তুমুল আলোড়ন! আজকের সুপারস্টার তনিমা, সেদিনের গৌরীর কাঁধে সিনেমার জিনটা ভর করেই ছিল। সেটা তাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলল। সে বুঝতে পারছিল, এমন সুযোগ আর কখনও আসবে না। এটাকে কোনওভাবেই হাতছাড়া করা ঠিক নয়। করলে যে স্বপ্নের চুড়োটাকে সে ছুঁতে চায় সেটা চিরকাল তার নাগালের বাইরেই থেকে যাবে।

তনিমাদের বাড়ির চালচলন, জীবনযাপনের ধাঁচ, সবই পুরনো আমলের। একালে পা থাকলেও তাদের মাথায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের যাবতীয় ধ্যানধারণা

অনড় হয়ে আছে। বাড়ির চৌহদ্দি ঘিরে রক্ষণশীলতার বেড়াজাল। সেটা ভেদ করে একেলে বেলেল্লাপনা ঢুকবার মতো এতটুকু ফাঁক নেই। স্ট্যাটাসকো, অর্থাৎ স্থিতাবস্থায় যাতে তিলমাত্র চিড় না ধরে সেদিকে ছিল তনিমার বাবা মণিভূষণ লাহিড়ির কড়া নজর। যেমনটি চলে আসছে ঠিক তেমনটিই চলুক, এটাই তিনি চাইতেন। তবে একটা ব্যাপারে তিনি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেন। সেটা হল শিক্ষা। ছেলে মেয়ে, সে যে-ই হোক, তাকে লেখাপড়া শিখতেই হবে। স্কুল-কলেজে যাওয়া ছাড়াও মেয়েরা বাইরে কোথাও বেরোক, আপত্তি নেই। কিন্তু সময়সীমা ঠিক করে দেওয়া ছিল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, সব বাড়িতে জানিয়ে আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টার ভেতর ফিরে আসতে হবে। সেকালের সঙ্গে একালের ভেজাল দিয়ে একটা বিচিত্র বর্ণসংকর লাইফ স্টাইল তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু মণিভূষণ জানতেন না, তাঁর বড় মেয়েটির মস্তিষ্কে বেয়াড়া, সৃষ্টিছাড়া একটা স্বপ্ন গোপনে ডালপালা ছড়িয়ে কী বিপুল আকার নিয়েছে। জানতে পারলে তিনি তো বটেই, তাঁর মৃত পূর্বপুরুষদের বিদেহী আত্মারা শিউরে উঠত।

দু-একটি খুব প্রিয় বান্ধবী, যারা তার লুকনো স্বপ্নটার কথা জানত, তাদের জুটিয়ে কলেজ পালিয়ে 'গ্রিন ভিউ হোটেল'-এ ছুটেছিল তনিমার। ফিল্মস্টার আর ডিরেক্টরের সঙ্গে মাত্র দু'মিনিটের জন্য দেখা করতে দিতে পুলিশের কাছে কত কাকুতি মিনতিই না করেছে! হাতে পায়ে ধরতে চেয়েছে, কিন্তু ওদের টালানো যায়নি।

হোটেলে না হোক, নদীর পাড়ের লোকেশনে কিন্তু তনিমাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। বন্ধুদের নিয়ে সেখানেও ঘোরের মধ্যে সে ধাওয়া করেছে। শুধু তারাই নয়, শহরের আরও অনেক যুবক যুবতী, কিশোর কিশারী, এমনকি বয়স্ক লোকেরাও। ফিল্ম তো সবাই দেখে, কিন্তু সেটা কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়, সে সম্বন্ধে তাদের লেশমাত্র ধারণা নেই।

লোকেশনে গার্ডেন আমব্রেলা জাতীয় বড় বড় রঙিন ছাতার তলায় মেক-আপ নিয়ে বসে থাকে নায়ক নায়িকা এবং অন্যান্য আর্টিস্টরা। দু'জন অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর স্ক্রিপ্টের খাতা দেখে তাদের সংলাপগুলো ঝালিয়ে দেয়। ওপাশে এলাহি কাণ্ড। ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যানের হাঁকডাক চলছেই। কোথায় ক্যামেরা বসানো হবে, কোথায় সাউন্ড রেকর্ডিস্ট তার মেশিন টেশিন বসলে আর্টিস্টদের সংলাপ নিখুঁতভাবে ধরা যাবে তাই নিয়ে চলে প্রচণ্ড ব্যস্ততা। বড় জোর তিনটে সাড়ে-তিনটে অব্দি শুটিং করা সম্ভব। কেননা তার পরেই সূর্য পশ্চিম দিকের উঁচু

উঁচু পাহাড়গুলোর ওধারে নেমে গেলে আলো কমে যাবে। ম্যাড়মেড়ে আলোয় ছবি তুললে ঝকঝকে ভাবটা থাকে না।

এখানেও থাকে প্রচুর পুলিশ। দু'টো পুলিশ একটা মোটা লম্বা দড়ির দুই মাথা টান করে ধরে রাখে। সেটার ওধারে শুটিং জোন, এধারে দর্শকদের ভিড়। দড়ি ডিঙিয়ে কারও ওপাশে যাবার উপায় নেই। কেউ যেতে চাইলেই পুলিশের দঙ্গলটা তাড়া দেয়, 'এই হটো—হটো—'

তনিমারা প্রথম সেদিন যায়, ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর শুটিং শুরু হল। ডিরেক্টর যেমন যেমন বলছে, অবিকল সেইভাবেই হাত-পা নাড়ছে আর্টিস্টরা, সংলাপ বলছে, চলছে ফিরছে। একেবারে কলের পুতুলের মতো। সেই সঙ্গে চালু হয়ে গেছে ক্যামেরা, সাউন্ড। সামান্য ভুলচুক হয়ে গেলে অ্যাক্টিং থামিয়ে দিয়ে নতুন করে করিয়ে নিচ্ছে ডিরেক্টর। কোনও কোনও শট 'ও. কে' হচ্ছে একবারেই। কোনওটা ঠিক হতে দু'বার তিনবার চারবারও লেগে যাচ্ছে।

দড়ি দিয়ে যে লক্ষ্মণের গণ্ডি টানা হয়েছে তার এদিকে সেই 'প্যাক-আপ' হাওয়া অব্দি ঠায় দাঁড়িয়ে শুটিং দেখে গেছে তনিমা। রুদ্ধশ্বাসে। তার চোখের পাতা পড়ছিল না। নায়িকাটিকে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, ওর চেয়ে অনেক বেশি আবেগ ঢেলে সে ডায়ালোগ বলতে পারে, চোখের তারায় কিংবা কোমরের ক্ষিপ্র দুলুনিতে বা গ্রীবার সুঠাম ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে পারে শতগুণ বেশি মাদকতা।

তনিমা খবর নিয়ে জেনেছিল, নদীর পাড়ের লোকেশনে টানা সাতদিন শুটিং হবে। নায়ক-নায়িকার কিছু রোমান্টিক দৃশ্য, নায়ক এবং ভিলেনের দলের দু-তিনটে বিরাট ফাইট সিকোয়েন্স, হাতে মারণাস্ত্র নিয়ে ভিলেনের গ্যাংয়ের নায়িকাকে বেশ ক'টা তাড়া করার সিনও থাকবে।

গোড়ার দিকে দিন দুয়েক আটাগুড়ির বাসিন্দারা সকাল হতে না হতেই পাহাড়ি নদীর সোনালি বালির সৈকতে বিপুল উৎসাহে ভিড় জমিয়েছে। কিন্তু সবারই জরুরি কাজকর্ম আছে। সিনেমার শুটিং নিয়ে মাতলে পেটের ভাত জুটবে কীভাবে? ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিকেয় তুলে ফিল্ম নিয়ে পড়ে থাকলে পরীক্ষায় পাস করবে কেমন করে? সিনেমা একবার মাথায় চেপে বসলে পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।

কাজেই উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। তৃতীয় দিন থেকে ভিড় কমে দাঁড়াল সিকিভাগ। কিন্তু আটাগুড়ির সেকেলে মাস্টারমশাই যাঁর মস্তিষ্কে প্রাচীন ধ্যানধারণা কামড়ে বসে আছে, তাঁর মেয়েটি কিন্তু ঘোরের মধ্যে রোজই নদীর পাড়ে ছুটতে লাগল। হাতে আর মোটে কয়েকটা দিন সময় আছে। শুটিং সেরে ফিল্ম পার্টি

একবার কলকাতায় ফিরে গেলে আর কোনও দিনই সুযোগ পাওয়া যাবে না। স্বপ্নটা এত কাছে চলে এসেছে। কোনও ভাবেই সেটা হাতছাড়া করা যায় না। কিন্তু পুলিশ কিছুতেই ফিল্মওলাদের কাছাকাছি ঘেঁষতে দিচ্ছে না। দড়ির সেই শক্ত হার্ডলটা না পেরুতে পারলে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

তনিমা মরিয়া হয়ে উঠল। রাতে ঘুমোতে পারে না। সারা দিন কেমন যেন নেশাগ্রস্তের মতো কেটে যায়।

হতাশার শেষ সীমায় যখন সে পৌঁছে গেছে সেই সময় হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গেল। ব্যাপারটা এমনই অযাচিত এবং চমকে দেবার মতো যে প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না।

সে টের না পেলেও সিনেমাওলাদের একজন তার ওপর শুটিং শুরুর দিন থেকেই নজর রাখছিল। ঘাগু লোক, চোখে বাজপাখির নজর। ফিল্মের গ্ল্যামার যে শত সহস্র যুবতীর ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে আছে সেটা তার জানা। এক পরমাশ্চর্য তরুণী কেন রোজ উত্তর বাংলার পাহাড়ি নদীর পাড়ে শুটিং দেখতে আসে তা আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা হয়নি লোকটার। হঠাৎ সেদিন পুলিশের টেনে রাখা দড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। বিভাজন রেখার ওধারে লোকটা। এধারে তনিমা।

লোকটার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। লম্বা, রোগাটে চেহারা। ভাঙা গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। উস্কো খুস্কো চুল। চোখে সরু ফ্রেমের চশমার ভেতর একজোড়া ধূর্ত চোখ। পরনে জিনস। খুঁটিয়ে লক্ষ করলে টের পাওয়া যায়, খুবই ধড়িবাজি। চতুর। চোখের তলায় পাতলা শ্যাওলার মতো কালচে ছোপে মার্কামারা লাম্পট্যের ছাপ। লোকটা হেসে হেসে বলেছিল, 'লক্ষ করেছি, আপনি রোজ শুটিং দেখতে আসেন। আপনার বুঝি সিনেমা খুব ভালো লাগে?'

ফিল্মের লোক যেচে নিজের থেকে এসে আলাপ করছে। সে ভালো কি মন্দ, এসব ভাবার মতো মনের অবস্থা তখন তনিমার নয়। আচ্ছন্নের মতো বলেছিল, 'ভীষণ—'

এরপর লোকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সম্বন্ধে সব জেনে নিয়েছিল। নিজের পরিচয়ও দিয়েছিল। নাম মহেশ বড়াল। যে ফিল্মের শুটিং চলছে সে তার অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর। হঠাৎ কিছু খেয়াল হতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'আরে, আপনাকে দড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন, আসুন—'

শুটিং জোনের কাছাকাছি, ক্যামেরার পাল্লার বাইরে চেয়ারে তনিমাকে নিয়ে গিয়ে খাতির করে বসিয়েছিল মহেশ। একটা স্পট বয়কে ডেকে তাকে চা দিয়ে বলেছিল, 'আপনি শুটিং দেখুন। আমার এখন প্রচুর কাজ। পরে গল্প করা যাবে।'

তনিমার মনে পড়ে, যত্ন করে তাকে শুটিংই দেখায় নি মহেশ। লাঞ্চ ব্রেকের সময় ডিরেক্টর হিরো হিরোইন ভিলেন এবং অন্য ক্যারেক্টার আর্টিস্টদের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিয়েছিল। এমনকি তাদের সঙ্গে লাঞ্চও খাইয়েছে।

প্যাক-আপের পর তনিমা যখন বাড়ি ফিরছে, বেশ খানিকটা পথ তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল মহেশ। সিনেমা নিয়ে এলোমেলো কথা বলতে বলতে আচমকা সে বলেছে, 'ফিল্মের ব্যাপারে আপনার এত ইন্টারেস্ট, অভিনয় করতে ইচ্ছে করে না?'

বুকের ধকধকানি লক্ষ গুণ বেড়ে যায় তনিমার। লোকটা কি থট-রিডার? মুখ দেখে মনের কথা টের পেয়ে যায়? মুখ নিচু করে সে হাঁটতে থাকে।

মহেশ হেসে হেসে বলে, 'বুঝেছি, করে। ওই যে আমাদের হিরোইনটিকে দেখলেন, সুজাতা, এখনকার গ্ল্যামার কুইন— ওঁর বয়েস কত জানেন? আটত্রিশ? বোধ হয় সাইলেন্ট যুগেও কাজ করেছে। হাড়ে শ্যাওলা ধরে গেছে। কিন্তু এখনও টিন-এজ লাভ-স্টোরিতে নায়িকার রোল করে যাচ্ছে। সুজাতা বলুন, মালিনী বলুন, কি বসুধা, নিবেদিতা—সবারই এক হাল। চড়া মেক-আপ নিয়ে খুকি সেজে বেড়াচ্ছে। আপনার মতো ফ্রেশ বিউটিফুল ফেস পর্দায় দেখাতে পারলে ওদের ছুটি হয়ে যেত।'

তার লুকনো স্বপ্নটাকে উসকে উসকে দিচ্ছিল মহেশ। বুকের ভেতরটা উথাল পাতাল হয়ে যাচ্ছিল তনিমার।

গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে মহেশ এবার বলেছে, 'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে পেলে লুফে নেবে।'

তনিমা উত্তর দেয়নি। মনে হচ্ছিল, সারা শরীরে তড়িৎপ্রবাহ খেলে যাচ্ছে।

'আমাদের এই ছবির কাস্টিং আগেই ঠিক হয়ে গেছে। ডিরেক্টর মানসদাকে বলে ছোটখাটো একটা রোলে নামিয়ে দিতে পারি। কী, নামবেন নাকি?'

তনিমা চমকে উঠেছে, 'না না, এখানে শুটিং করলে বাবা মা, সবাই জেনে যাবে। আমাদের ফ্যামিলি ভীষণ কনজারভেটিভ। আমি সিনেমায় পার্ট করছি জানতে পারলে বাবা আমাকে কেটে ফেলবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছে মহেশ। তারপর বিবেচকের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে, 'না। দু-চার সিনের রোলে নামিয়ে আপনার ফিউচারটা নষ্ট করা ঠিক হবে না। হেমা মালিনী যখন সাউথ থেকে এসে হিন্দি ফিল্মে নামে, কী করা হয়েছিল জানেন?'

তনিমা আস্তে মাথা নাড়ে। না, জানে না।

মহেশ বলে, 'হোল বম্বে সিটি তার বিরাট বিরাট কাট-আউট, কিয়স্ক আর পোস্টারে তার কালার ছবি দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছিল। শুধু কি বম্বে, দেশের সব বড় বড় শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে তার পোস্টার। ইংরেজি বাংলা মারাঠি গুজরাটি—ইন্ডিয়ার সমস্ত মেজর ল্যাঙ্গুয়েজ পেপারের ফুল পেজ জুড়ে তার পাবলিসিটি। সিনেমা ম্যাগাজিনগুলোর সেন্টার-স্প্রেডে শুধু হেমা মালিনী। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আসাম থেকে গুজরাট সব জায়গায় পাবলিসিটি—ড্রিম গার্ল অ্যারাইভস। সপনো কা রানি আ গয়ী। হেমা গ্রেট আর্টিস্ট, গ্রেট ড্যান্সার, ওয়ান অফ দা মোস্ট বিউটিফুল উইমেন ইন দা ওয়ার্ল্ড। কিন্তু একশো কোটি মানুষের ভেতর এরকম এক লাখ মেয়ে কি নেই? কিন্তু স্বপ্নসুন্দরী ওই একজনই হয়েছে। পাবলিসিটির এমনই মহিমা।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মহেশ ফের শুরু করে, 'হিন্দি ফিল্মের বিশাল বাজার। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মার্কেট। হেমা মালিনীর মতো অত বড় স্কেলে না হলেও আপনাকে নিয়েও হল্লা বাধিয়ে দেওয়া যায়।'

প্রবল উত্তেজনায় শ্বাস প্রশ্বাস আটকে আসে তনিমার।

মহেশ বলেই চলেছে, 'আমরা আর কয়েকদিন আটাগুড়িতে আছি। যদি সিনেমায় নামার কথা ভাবেন, আমার সঙ্গে এর ভেতর কনট্যাক্ট করতে পারেন।' একটু ভেবে বলেছে, 'বাইরে দেখা করার দরকার নেই। আমি বরং আপনাদের বাড়ি গিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলব। মেয়ে সিনেমায় নামবে, তার গার্জেনের পারমিশান নেওয়া উচিত।'

আঁতকে উঠেছে তনিমা, 'আপনাকে তো বলেছি, আমাদের বাড়ি ভীষণ সেকেলে। ফিল্মের লোকজনকে বাবা ভেতরে ঢুকতেই দেবে না।'

'তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল—'

মুশকিলটা কিসের, বুঝতে না পেরে তনিমা মহেশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মহেশ বলে, 'কোনও বড় কাজে নামতে গেলে মা-বাবার আশীর্বাদ চাই-ই চাই। সিনেমার লোকজনকে ওঁরা যখন পছন্দ করেন না তখন আমি আপনাদের বাড়ি যাব না। কিন্তু ওঁদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে আপনাকেই রাজি করাতে হবে।'

'ওরা কিছুতেই রাজি হবে না।'

'মা-বাবার আশীর্বাদটা' ধুরন্ধর মহেশের একটা দুর্ধর্ষ দাবার চাল। সে জানে, উত্তর বাংলার এক তরুণীর নাকে অদৃশ্য বড়শি আটকে দিতে পেরেছে। এখন যেভাবে তাকে খেলানো হবে সেভাবেই মেয়েটা খেলতে থাকবে। তার সামনে

টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে চোখ-ঝলসানো গ্ল্যামারের মোহময় জগৎ। সে রাতারাতি মহানায়িকা হয়ে গেছে। তার অজস্র ফ্যান। কিয়স্কে তার ছবি, পোস্টারে তার ছবি। খবরের কাগজ, ফিল্ম ম্যাগাজিন তার ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। তার পেছনে ছুটছে টিভির নানা চ্যানেলের ফোটোগ্রাফাররা। ক্যামেরায় অনবরত শব্দ হচ্ছে ক্লিক, ক্লিক। ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলে উঠেছে মুহুর্মুহু। হাজার হাজার ফ্যান তাকে এক ঝলক দেখার জন্য উন্মাদ। যে মেয়ে এ-সবে বিভোর, মা-বাবার আশীর্বাদের জন্য সে বিন্দুমাত্র পরোয়া করবে না।

মহেশ তনিমাকে খেলিয়েই চলে, 'এখন আর কথা বলার সময় নেই। ইউনিটের লোকেরা নিশ্চয়ই আমাকে খোঁজাখুঁজি করছে। যদি মা-বাবাকে বোঝাতে পারেন, আমার সঙ্গে দেখা করবেন। চলি—'

মহেশকে থামিয়ে দিয়ে তনিমা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে?'

চোখ আধাআধি বুজে কিছুক্ষণ চিন্তা করে মহেশ বলে, 'হোটেলে বা নদীর পাড়ের লোকেশনে ভিড়ের ভেতর ভালো করে কথা বলা যাবে না। এক কাজ করুন, কাল সন্ধেবেলা আপনাদের টাউনের মাঝখানে যে সেন্ট্রাল পার্কটা রয়েছে সেখানে আসতে পারবেন?'

বুকটা ধক করে উঠেছে তনিমার। সে কলেজে যেতে পারে, বন্ধুদের বাড়ি যেতেও বাধা নেই। কিন্তু সব দিনের বেলায়। যেখানেই যাক, সূর্যাস্তের আগে বাড়ি ফিরতেই হবে। কিন্তু এত বড় সুযোগটা কোনও ভাবেই হাতছাড়া করা যায় না। তার বাবা মণিভূষণ লাহিড়ি এমনিতে ঠাণ্ডা মানুষ। কিন্তু কেউ পারিবারিক ডিসিপ্লিন ভাঙলে তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। তখন রাগের মাথায় কী করে বসবেন, কে জানে।

যা হবার হবে, হঠাৎ এমন একটা একরোখা ভাব মাথায় চেপে বসে তনিমার। বলে, 'পারব।'

ভালোমানুষের মতো মুখ করে মহেশ বলে, 'দেখুন, সবাইকে সিনেমায় নামতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। আপনার ভেতর সম্ভাবনা আছে ভেবেই বলেছি। যদি মা-বাবার মত নিয়ে আসতে পারেন, তবেই কাল পার্কে আসবেন। নইলে নয়।'

তনিমা তখন এমনই আচ্ছন্ন যে অন্য কোনও দিকেই নজর ছিল না। সে জোর দিয়ে বলেছে, 'আমি নিশ্চয়ই আসব।'

পরদিন সন্ধেয় একটাই বাঁচোয়া, বাবা বাড়ি ছিলেন না। মাকে বন্ধুর কাছ থেকে খুব দরকারি বই আনতে যাচ্ছে বলে তনিমা পার্কে চলে গিয়েছিল।

মহেশ অপেক্ষা করছিল। ধানাইপানাই না করে সে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসে। আটাগুড়িতে পড়ে থাকলে বাংলা সিনেমার মহানায়িকা হওয়া যাবে না। সে-জন্য তাকে কলকাতায় যেতে হবে। মহেশরা আরও কয়েক দিন এখানে থাকবে। যদি তনিমা কলকাতায় যেতে চায়, তাকে যেন জানিয়ে দেয়।

নায়িকা হবার স্বপ্ন তখন তনিমাকে পুরোপুরি গিলে ফেলেছে। সে মনস্থির করে ফেলে। কলকাতায় তাকে যেতেই হবে।

মহেশ সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। সিনেমার সেই ইউনিটের সঙ্গেই ট্রেনে তনিমা কলকাতায় যাবে। তবে এক কম্পার্টমেন্টে না, আলাদা কামরায়। কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে অথৈ সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার মতো কলকাতার ট্রেনে উঠেছিল তনিমা। কেন তাকে ইউনিটের লোকজনের সঙ্গে এক কামরায় আনতে চায়নি তার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ পেশ করেছিল মহেশ। আউটডোর শুটিংয়ে এসে আটাগুড়ি থেকে অনাত্মীয়, সদ্য-চেনা একটি যুবতী মেয়েকে নিয়ে চলেছে, তা জানাজানি হলে সবাই তুমুল হুলস্থূল বাধিয়ে দেবে। শুধু তাই না, জোর করে তারা তনিমাকে তার মা-বাবার কাছে দিয়ে আসবে। ফলে তার স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে। তনিমা এ-সব কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। নিশিতে-পাওয়া মানুষের মতো সে তখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

কলকাতায় এসে তনিমাকে একটা ছোটখাটো হোটেলে নিয়ে তুলেছিল মহেশ। আব সেদিন রাত্তিরেই একটি মেয়ের জীবনে সবচেয়ে যা পবিত্র, সবচেয়ে মহার্ঘ, সেটি খোয়া গেল। তার কৌমার্য।

বাকি রাত অঝোরে কেঁদেছিল তনিমা। কলকাতার ট্রেনে যখন ওঠে তখনই জানত আর কোনও দিনই আটাগুড়িতে ফেরা হবে না।

কয়েক ঘণ্টা উতরোল কান্নার পর পরদিন আশ্চর্য রকমের নিঝুম হয়ে গিয়েছিল তনিমা। বাইরেটা থমথমে, কিন্তু ভেতরে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। একবার ভাবল, মহেশকে খুন করে ফেলবে। একবার ভাবল, যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে? কলকাতায় এর আগে দু-একবার মোটে এসেছে। এখানকার কিছুই প্রায় সে চেনে না। আত্মীয়-পরিজন কেউ নেই। থাকলেও কি তাদের কাছে যাওয়া যেত? প্রশ্ন উঠত হাজারটা। একা একা কোত্থেকে এল? কেন এল? কী কৈফিয়ত দিত সে? একটা পথই তখন খোলা রয়েছে। আত্মহত্যা। এই সব এলোপাতাড়ি চিন্তার মধ্যেই আচমকা নিজেকে শক্ত করে নেয় সে। প্রচণ্ড এক জেদ মাথায় ভর করে। না, নিজেকে বিনাশ করা নয়। বাড়ি ফেরার সব পথ বন্ধ করে যে-কারণে সে কলকাতার ট্রেনে উঠেছিল তার শেষ না দেখে ছাড়বে না।

বিছানার এক কোণে বসে ছিল মহেশ। তার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে ছিল তনিমা। নর্দমার পোকার মতো নোংরা এই লোকটাকে দেখতে দেখতে গা ঘিন ঘিন করছিল তার, পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে বমি উঠে আসতে চাইছিল। তবু মনে হয়েছে, এই লোকটাকে আঁকড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। পরেও এই ধরনের জঘন্য কীট তার জীবনে অনেক এসেছে। পৃথিবীর সবটুকু ঘৃণা তাদের ওপর ঢেলে দিয়েছে সে, তাদের খুন করতে চেয়েছে। আবার তাদেরই আঁকড়ে ধরে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

সেদিন মহেশকে সে বলেছিল, 'তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। তার রিটার্নটা ভালোই দিয়েছ। আমার সর্বনাশ তো করলে। দয়া করে একটা অনুরোধ রাখবে?'

মহেশ তনিমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। মুখ নামিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করেছে, 'কী অনুরোধ?'

'দেখো আমার পেটে যেন বাচ্চা না আসে। তেমন বিপদে তুমি আমাকে ফেলো না।' বলেই চমকে উঠেছে তনিমা। তাদের রক্ষণশীল পরিবার। সেখানে শুধুই শালীনতা শৃঙ্খলা আর শিষ্টাচার। একজন শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশায়ের মেয়ে সে। তার মুখ দিয়ে এত অবলীলায় এ-জাতীয় কথা বেরুতে পারে, কস্মিনকালেও নিজেই কি তা ভাবতে পেরেছিল? আশ্চর্য, মাত্র একটা রাত তাকে আমূল বদলে দিয়েছে। মাথায় রঙিন স্বপ্ন ভরে নিয়ে অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ফানুসের মতো যে মেয়েটা মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল, আচমকা সে আছড়ে এসে পড়েছিল পৃথিবীর কর্কশ মৃত্তিকায়।

ওদিকে মহেশ মুখ তোলেনি। আস্তে মাথা নেড়েছে শুধু। অর্থাৎ তনিমার কথা রাখবে।

তনিমা এবার জিজ্ঞেস করেছে, 'যে জন্যে তোমার সঙ্গে কলকাতায় এসেছি তার কী হবে?'

মহেশ বলেছে, 'খুব শিগগিরই প্রডিউসারদের কাছে নিয়ে যাব। তারা নিশ্চয়ই তোমাকে পছন্দ করবে।'

'খুব শিগগির' অবশ্য প্রডিউসারদের কাছে যাওয়া হয়নি। দু-তিন দিন হোটেলে কাটিয়ে পার্ক সার্কাসে দেড় কামরার একটা ছোট ফ্ল্যাটে তনিমাকে নিয়ে তুলেছিল মহেশ। এলাকাটায় বাঙালি খুব কম। বিহারি মুসলমান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, মাড়োয়ারি আর সিন্ধিরাই সংখ্যায় বেশি। বেশ কিছু শিখও ছিল। চিরকাল তো হোটেলে থাকা যায় না। তাই এই ফ্ল্যাট। এমন একটা পাঁচমেশালি পাড়ায় নিয়ে যাবার হেতুটা জানিয়ে দিয়েছিল মহেশ। ওখানকার বাসিন্দারা যে-যার নিজের তালে থাকে। পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন সম্পর্কে তাদের আগ্রহ নেই। দেখা হলে 'নমস্তে' কি 'আদাব' বা 'ক্যায়সা হায়?'—ব্যস। বাঙালি পাড়ায় থাকলে প্রচুর

সমস্যা। বাঙালিদের ভীষণ নাক-গলানো স্বভাব। পড়শিদের হাঁড়ির খবর না নিলে পেটের ভাত হজম হয় না। মহেশের সঙ্গে তনিমার কতদিন বিয়ে হয়েছে? তার বাপের বাড়ি কোথায়? বাবা-মা, ভাই-বোন আছে কিনা? মহেশ কী করে? চাকরি না ব্যবসা? ইত্যাদি ইত্যাদি। হাড় একেবারে ভাজা ভাজা করে ছাড়বে। তারপর যদি টের পায় ওদের বিয়ে হয়নি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে ফেলবে।

যে-ছবির আউটডোর শুটিং করতে মহেশরা আটাগুড়ি গিয়েছিল, কলকাতায় আসার সপ্তাহখানেক বাদে টালিগঞ্জের স্টুডিওতে তার ইনডোর শুটিংয়ের ডেট পড়ল। পাঁচদিনের শিডিউল।

শুটিংয়ের আগে মাঝখানের ক'টা দিন পার্ক সার্কসের ফ্ল্যাটেই শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল মহেশ। হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হতে তনিমা জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি তো দিনরাত এখানে পড়ে থাক। নিজেদের বাড়িতে যাও না। বাড়িতে কেউ নেই?'

সচকিত মহেশ উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমটা থতিয়ে গেছে। তারপর জানিয়েছে, ভবানীপুরে তাদের পৈতৃক বাড়ি। সেখানে ভাই-টাইরা থাকে। বোঝাতে চেয়েছে, তার পিছুটান নেই। সংসারের সঙ্গে বন্ধনটা পলকা সুতোয় জড়ানো। বাড়িতে গেলেও হয়, না গেলেও কেউ উতলা হবে না।

অনেক পরে অ.শ্য তনিমা জানতে পেরেছে, মহেশ বিবাহিত। ভবানীপুরের বাড়িতে তার বউ ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু তখন আর এ-নিয়ে তার লেশমাত্র কৌতূহল ছিল না। ততদিনে মহেশ তার জীবন থেকে পুরোপুরি খারিজ হয়ে গেছে।

ইনডোর শুটিংয়ের প্রথম দিন সকালে মহেশ যখন স্নান-টান সেরে বেরুতে যাবে, ভয় পেয়ে গিয়েছিল তনিমা। এই লোকটা যদি তাকে পার্ক সার্কাসে ফেলে রেখে চিরকালের মতো পালিয়ে যায়? আর না ফিরে আসে? ত্রস্ত সুরে জিজ্ঞেস করেছে, 'কখন আসছ তুমি?'

গলার স্বর শুনে তনিমার মনোভাবটা আন্দাজ করে নিয়েছিল মহেশ। বলেছে, 'পাঁচটা অব্দি শুটিং। তারপর কিছু কাজ আছে। ভেবো না, ঠিক সাতটার ভেতর পৌঁছে যাব।'

তনিমা জানত না, সে যেমন স্বপ্নপূ..ণের জন্য মহেশের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল, মহেশও তেমনি তাকে ঘিরে মনে মনে তার নিজস্ব স্বপ্নের ভিত গাঁথতে শুরু করেছে। তনিমাকে ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

পাঁচ দিনের ইনডোর শুটিংয়ের শিডিউলটা শেষ হবার পর তনিমাকে প্রডিউসারদের অফিসে অফিসে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল মহেশ। যাওয়ার আগে বিউটি পারলার থেকে তার মেক-আপ করিয়ে নিত।

সাজসজ্জার পর আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বটি দেখে বিভোর হয়ে যেত তনিমা। দর্পণের ওই রমণীটি যেন এক মায়াকাননের পরী। ওটা যে সে নিজেই, বিশ্বাস হত না।

কয়েকদিনের ভেতর তিনজন প্রডিউসারের সঙ্গে দেখা করল মহেশরা। তাদের একজন আগরওয়াল, একজন নোপানি, আর একজন হালদার।

প্রথমে যাওয়া হয়েছিল নোপানির অফিসে। তারা চার পুরুষ ধরে কলকাতায় আছে। বড়বাজারে বিরাট কাপড়ের বিজনেস। অনেকগুলো বড় বড় মিলের ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার এজেন্ট। অঢেল পয়সা। ফিল্মটা তার শখ। বাংলাটা অনর্গল বলতে পারে। এতটুকু জড়তা নেই।

মাঝবয়সি নোপানি তনিমাকে দেখে স্থির বসে থাকতে পারছিল না। কেমন একটা আনচান ভাব। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। আচমকা রক্তচাপ বেড়ে গেলে যেমন হয়, মুখচোখের চেহারা সেইরকম। এয়ার-কন্ডিশনড কামরাতেও কপালে দানা দানা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে। তনিমা যেন দেখতে পাচ্ছিল, লোকটার কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। পারলে তাকে তক্ষুনি গিলে খায়।

মহেশ মুখে এমন একটা গলে-পড়া ভাব ফুটিয়ে তুলছিল যেন প্রভুভক্ত কুকুরের মতো নোপানির পায়ে লুটিয়ে পড়বে। হাত কচলাতে কচলাতে বলেছে, 'নোপানিজি, আপনি বলেছিলেন, নতুন হিরোইনের খুব অভাব। পুরনোদের দেখে দেখে লোকের চোখ পচে গেছে। এখন ফ্রেশ মুখ চাই। নইলে বাংলা ফিল্মের বারোটা বেজে যাবে।' তনিমাকে দেখিয়ে বলেছিল, 'এই দেখুন টাটকা ফেস নিয়ে এসেছি। একে হিরোইন করে নামালে ফাটিয়ে দেবে। আপনি বলুন, টালিগঞ্জে এরকম বিউটি আর একটাও আছে?'

সামনে বসে নিজের রূপের কীর্তন শুনতে শুনতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তনিমা। কী যে অস্বস্তি!

নোপানিকে স্বীকার করতেই হয়েছে, তনিমা সত্যিই সুন্দরী।

মহেশ একনাগাড়ে বলে গেছে, 'নোপানিজি, আপনি কথা দিয়েছিলেন, ফ্রেশ হিরোইন পেলে আমাকে ডিরেকশানের একটা চান্স দেবেন। হিরোইন তো নিয়ে এলাম। এবার—মানে, অনেক আশা করে আছি। এটা আমার ড্রিম—'

নোপানি আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে। 'বলেছিলাম ঠিকই, আপনার মতো

একজন এফিসিয়েন্ট লোককে ব্রেকও দেওয়া দরকার। হোল লাইফ তো অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর হয়ে কাটানো যায় না। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'আপনি তো জানেনই, আজকাল ছবি করার কস্ট কিরকম বেড়ে গেছে! পার পিকচার মিনিমাম সত্তর-আশি লাখ। তার ওপর বাংলা ছবির যা হাল! মার্কেট ছোট। ইনভেস্টমেন্টের টাকা কবে উঠবে, অ্যাট অল উঠবে কিনা, কে জানে। এই অবস্থায় নতুন ডিরেক্টর, নতুন হিরোইন নিয়ে ছবি—ব্যাপারটা রিস্ক হয়ে যাবে—'

'নোপানিজি, সবাই তো প্রথমে নতুন থাকে। আপনি আগে কত জনকে ব্রেক দিয়েছেন। আর্টিস্ট, ডিরেক্টর, মিউজিক ডিরেক্টর—'

'সে-সব দিন কি আর আছে? আচ্ছা আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

আশাটা বিলীন হয়ে যাচ্ছে দেখে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে মহেশ, 'নোপানিজি, যদি পারমিশন দেন, আপনার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের অ্যাপার্টমেন্টে রাত্তিরে গিয়ে আমরা দেখা করব। তখন না হয়—'

'না না, এখন থাক। যোগাযোগ রাখবেন, কী করা যায় দেখি—'

নোপানির পর আগরওয়াল। তারপর হালদার। সব জায়গাতেই একই রকম সংলাপ। একই ধরনের অভিজ্ঞতা। নোপানির মতো আগরওয়াল আর হালদারেরও তনিমাকে দেখে চোখের তারা ঠিকরে পড়েছে, লালা ঝরেছে। কিন্তু তিন জনেই ভীষণ হুঁশিয়ার। ষাট-সত্তর লাখ টাকার ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না।

তনিমা এর মধ্যেই টের পেয়ে গেছে, তাকে সামনে রেখে পরিচালক হতে চায় মহেশ। তারা দু'জনেই একে অন্যকে সিঁড়ি করে অনেক উঁচুতে ঝুলে থাকা দুর্লভ স্বপ্নকে ছুঁতে চাইছে।

তিন জায়গায় ধাক্কা খেয়ে তনিমা হতাশ। অসহিষ্ণু সুরে বলেছে, 'কিছুই তো হচ্ছে না—'

মহেশ লোকটা বদ, দুশ্চরিত্র, নোংরা। কিন্তু চূড়ান্ত আশাবাদী। তার বিশ্বাস, লেগে থাকলে ইচ্ছাপূরণ হবেই। সে জন্য ধৈর্যটা ভীষণ জরুরি। বলেছিল, 'অস্থির হয়ো না। মোটে তো তিনজন প্রডিউসারের কাছে গেছি। ওরাই কি সব নাকি? আরও গণ্ডা গণ্ডা আছে একে একে তাদের কাছে যাব। কাউকে না কাউকে আমাদের চান্স দিতেই হবে।'

তনিমা খুব একটা ভরসা পায়নি। সে শুধু বলেছে, 'মনে হচ্ছে, চান্সের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে আমার চুল পেকে যাবে।'

মহেশের এনার্জির শেষ নেই। সে তনিমাকে বিউটি কনটেস্টে নামানোর মতো সাজিয়ে প্রডিউসারদের দরজায় দরজায় হানা দিতে লাগল।

প্রথমে তিন। তারপর আরও দশ। মোট তেরো জনের কাছে যাতায়াতের পর চোদ্দ নম্বর প্রডিউসারটির অফিসে গিয়ে শিকে ছিঁড়ল।

লোকটির পদবি গুপ্তা। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। তামাটে রং, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। ছড়ানো চোয়াল। সরু ফিতে বাঁধা চশমার ভেতর লালচে, ঝকঝকে চোখ। মোটা রোমশ ভুরু। মাথায় উইগ, পরনে দামি সাফারি স্যুট।

গুপ্তা লোকটা দু'কান কাটা। কোনওরকম ধানাইপানাই নেই। সরাসরি কাজের কথায় চলে এল। 'দিস ইয়াং লেডি বহুত বিউটিফুল। নো ডাউট অফ ইট। লেকিন স্রিফ খুবসুরতি দিয়ে তো ফিল্ম হয় না। হিরোইন কেমন হবে সেটা বাজিয়ে দেখা দরকার। মহেশ, তুমি এক কাম কর—'

মহেশ শশব্যস্তে বলে উঠেছে, 'বলুন গুপ্তাজি—'

'কাল ইভনিংয়ে লেড়কিকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এস। থিয়েটার রোড, বিল্ডিংয়ের নাম 'ম্যারিগোল্ড', ফিফথ ফ্লোর, অ্যাপার্টমেন্ট সেভেন।'

'আমি জানি গুপ্তাজি—'

গুপ্তার ঠোঁটে ফিচেল একটু হাসি ফোটে। 'ওয়ার্ল্ডের সব শালাই দেখছি আমার প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা জেনে গেছে।'

গুপ্তার অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে মহেশ খুশিতে কী করবে, কী না-করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। সে যেন ট্যাক্সির সিটে বসে নেই, হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, হাত নেড়ে নেড়ে বাচ্চাদের মতো হয়ে যাচ্ছিল। 'ওঃ, এতদিনে যা চাইছিলাম পেয়ে যাব। ধরেই নাও আমরা জ্যাকপট পেয়ে গেছি। আজকের দিনটা আমাদের লাইফে রেড-লেটার ডে। ওঃ, ভাবাই যায় না—'

মহেশের ওপর হিস্টিরিয়া যেন ভর করেছে। তার পাগলামির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না তনিমা। ভুরু কুচকে জিজ্ঞেস করেছে, 'হঠাৎ কী হল তোমার?'

মহেশ বলেছে, 'আমার কাঁধে ডানা গজিয়ে গেছে। আমি উড়ছি—'

'মানে?'

'তুমি কি জানো, গুপ্তাজি যখন কোনও মেয়েকে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে ডাকেন, সে হিরোইন হবেই। তোমার লাকটা টেরিফিক। এবার তোমার শাড়ির আঁচল ধরে আমিও আর অ্যাসিস্টান্ট নয়, পুরো ডিরেক্টর হয়ে যাব।'

পরদিন 'ম্যারিগোল্ড'-এ তনিমাকে নিয়ে সন্ধের পর হাজির হয়েছিল মহেশ।

গুপ্তার অ্যাপার্টমেন্টটা বিশাল। তার সিকিভাগ জুড়ে লিভিং-কাম-ডাইনিং

হল। ফ্লোর জুড়ে পুরু কার্পেট, পঞ্চাশ ইঞ্চি স্ক্রিনের টিভি, মিউজিক সিস্টেম, দামি দামি ক্যাবিনেট, সিলিং থেকে অনেকগুলো ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। দেওয়ালে এয়ার-কন্ডিশনার। হল-ঘরটা ঘিরে কয়েকটা বেডরুম, কিচেন ইত্যাদি।

আটাগুড়ির এক স্কুলমাস্টারের মেয়ের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। এই অ্যাপার্টমেন্ট যার, সেই লোকটার যে কত টাকা, ভেবে পাচ্ছিল না তনিমা।

গুপ্তা লিভিং রুমে বসে ছিল। গায়ে বাড়িতে পরার ঢিলেঢালা পোশাক। যথেষ্ট দামি। খানিকটা স্লিপিং গাউন ধাঁচের। সিনেমার বড়লোকদের এমনটা পরতে দেখেছে তনিমা।

গুপ্তা বেশ ফুরফুরে মেজাজে ছিল। তনিমাদের বসিয়ে কিছুক্ষণ হালকা চালে গল্প করল। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সম্বন্ধে সব জেনে নিচ্ছিল। তনিমা প্রায় কিছুই গোপন করেনি। সিনেমার টানে সে যে উত্তরবঙ্গের এক নগণ্য শহর থেকে কলকাতায় চলে এসেছে, এবং মহেশের কাছে আছে, তাও বাদ দেয়নি।

তখনও তনিমা 'তনিমা' হয়ে ওঠেনি। বাবার দেওয়া গৌরী নামটা বজায় আছে। শুনে গুপ্তা বলেছিল, 'ওসব নাইনটিনথ সেঞ্চুরি মার্কা নাম সিনেমায় চলবে না। বহুত স্মার্ট, মডার্ন নাম চাই। যাক, সে-সব পরে ভাবা যাবে।'

তনিমার মনে পড়ে, খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর বেয়ারাকে ডেকে হুইস্কি দিতে বলেছিল গুপ্তা। শুধু পানীয়ই না, সেই সঙ্গে প্রচুর খাবারদাবারও। সেগুলো হাজির হলে একটি পানপাত্র তার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে গুপ্তা বলেছে, 'তুমি আমার নেক্সট ফিল্মের হিরোইন হচ্ছ। নাউ লেট আস সেলিব্রেট দা বিগ ইভেন্ট—'

সেই কিশোরী বয়স থেকে যে স্বপ্নটা দেখে আসছে, এতদিনে সেটা হাতের কাছে চলে এসেছে। শরীরে তড়িৎপ্রবাহ খেলে গিয়েছিল তনিমার কিন্তু পাশাপাশি অদ্ভুত এক আতঙ্ক তাকে কুঁকড়ে দিচ্ছিল। হুইস্কির নামটা জানা আছে, তবে স্বচক্ষে সেই প্রথম দেখল। তাদের আটাগুড়ির বাড়িতে এটা চলবে না, সেটা চলবে না। কত রকমের যে ট্যাবু। চারপাশে নিয়ম আর সংস্কারের খাড়া খাড়া দেওয়াল। সেগুলো ভেদ করে হুইস্কি তো দূরের কথা, পানসুপুরি অব্দি ঢুকতে পারত না।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত লিভিং রুমে বসেও ঘামে জামাটামা জবজবে হয়ে যাচ্ছিল তনিমার। গলা শুকিয়ে কাঠ। মুখে কথা ফুটছিল না। ভয়ে ভয়ে হাত নেড়ে সে শুধু না না করে গেছে।

গুপ্তার হয়তো করুণাই হয়েছে। সুদূর মফস্বলের একটি মেয়ে প্রথম দিন হুইস্কির গেলাস হাতে তুলে নেবে, এতটা আশা করা রীতিমতো বাড়াবাড়িই। হেসে হেসে সে বলেছে, 'ঠিক আছে, আজ থাক। পয়লা দিনের পক্ষে ব্যাপারটা টু মাচ হয়ে যাবে, তাই না? সিনেমা লাইনে আমি বহুত দেখেছি। ইয়াং ছুকরিরা কুছ রোজ

সতী থাকে। তারপর হুইস্কির দরিয়ায় ডুবকি মারে।' বেয়ারাকে তনিমার জন্য সফট ড্রিংক আনতে বলেছিল সে।

ওদিকে হুইস্কির বোতল ফাঁকা করতে করতে গোগ্রাসে কাটলেট রোস্ট কাবাব সাবাড় করে চলেছে মহেশ। খাওয়ার ভঙ্গিটা জঘন্য। রুচির বালাই নেই। কেউ যেন কেড়ে নেবে, তাই ঠেসে ঠেসে মুখে পুরে প্রাণপণে চিবিয়ে চলেছে। চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। লোভী, হ্যাংলা লোকটাকে দেখতে দেখতে গা গুলিয়ে উঠছিল তনিমার, ভেতরে ভেতরে বিবমিষা জাগছিল।

রাত বাড়লে গুপ্তা মহেশকে বলেছে, 'তুমি এবার যাও।'

স্পষ্ট করে বললেও সেটা যেন বুঝতে পারছিল না মহেশ। ঘোরের ভেতর থেকে বলল, 'যাব?'

'যাবে না? ঘড়ি দেখ, সোয়া দশটা বেজে গেছে।'

'কিন্তু—'

'কী হল?'

'কাজের ব্যাপারটা নিয়ে—'

'গৌরীকে হিরোইন করব তো বললাম।'

'কিন্তু আমার ডিরেকশনের—'

মহেশকে শেষ করতে দিল না গুপ্তা। ধমকের সুরে বলল, 'ওঠো। কুইক—'

নেশাটা চড়ে গিয়েছিল মহেশের। চোখ ঘোলাটে লাল। মাথাটা মাথার জায়গায় থাকতে চাইছে না, ভীষণ কাঁপছে। হাঁটু দু'টোর একই হাল। সোফার হাতলে ভর দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। জড়ানো গলায় বলে, 'ঠিক আছে গুপ্তাজি। এস গৌরী—'

কয়েক পেগ হুইস্কিতে গুপ্তার নার্ভগুলো সামান্য চাঙ্গা হয় শুধু। হাত-পা কাঁপে না। চোখ পুরোপুরি ফরসা। সে বলল, 'ও থাকবে। এগ্রিমেন্টে কী কী কন্ডিশন রাখা হবে, তা নিয়ে থোড়াকুছ ডিসকাসান আছে।'

প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগল যেন মহেশের। টলটলায়মান ভাবটা লহমায় উধাও। শিরদাঁড়া টান টান হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করল, 'ও যাবে না?'

গুপ্তার সুর কড়া হয়ে ওঠে, 'আর ইউ আ বেঙ্গলি?' তর্জমা করে বলল, 'তুমি বাঙালি তো?'

মহেশ থতিয়ে যায়, 'হ্যাঁ, কিন্তু—'

'আমি প্লেন বাংলায় বলছি—গৌরী যাবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? বাট ইউ মাস্ট গো। নাউ গেট আউট—'

মুখটা ছাইবর্ণ হয়ে যায় মহেশের। নেশার ঘোর ছুটে গেছে। মুহূর্তে সমস্ত কিছু তার কাছে পরিষ্কার। তনিমা হাত বদল হয়ে গেছে। তবু মরিয়া হয়ে শেষ একটা চেষ্টা করে সে, 'গুপ্তাজি, আমি কি গৌরীকে কাল সকালে এসে নিয়ে যাব?'

গুপ্তা খুব ঠাণ্ডা চোখে মহেশের দিকে তাকায়। 'আমি যখন খবর দেব, তখন আসবে। এগেন আই সে, গেট আউট—'

হাতের মুঠো থেকে মহামূল্যবান কিছু একটা খোয়া গেছে। এক পলক তনিমাকে দেখে লাথি-খাওয়া কুকুরের মতো দরজার দিকে এগিয়ে যায় মহেশ। লোকটা ঘণ্টাতিনেক আগে যখন এই অ্যাপার্টমেন্টে আসে, উৎসাহে উত্তেজনায় টগবগ করছিল। এখন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে চুরে একটা ধ্বংসস্তূপ। ধুঁকতে ধুঁকতে সে বেরিয়ে গেল।

তনিমার শ্বাসপ্রশ্বাস থেমে গেছে। হৃৎপিণ্ডের তলা থেকে তীব্র কনকনানি উঠে আসছে। সেই স্বপ্নের ভূতটা একদিন তাকে কলকাতার ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। আজ ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে থিয়েটার রোডের এই অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এসেছে। মহেশকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে সে, তবু তাকেই আঁকড়ে ধরেছিল। কিন্তু এই গুপ্তা লোকটা কেমন, জানা নেই। একে কি বিশ্বাস করা যায়? যেমনই হোক, এই ফাঁদ থেকে বেরুবার উপায় নেই।

তনিমার শরীর ভয়ে, আশঙ্কায় ক্রমশ কাঠ হয়ে যাচ্ছিল।

গুপ্তা একেবারেই সময় নেয়নি। লিভিং রুমে বসেই তনিমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিয়েছে। অনেকটা নিয়তির মতো। দু'বছর তনিমাকে তার কোম্পানিতে 'এক্সক্লুসিভ' হয়ে থাকতে হবে। এই সময়টা সে তাদের বাঁধা আর্টিস্ট। অন্য কোনও প্রডিউসার অফার দিলেও নিতে পারবে না। শুধু তাই না, কলকাতায় গুপ্তার আরও তিন চারটে অ্যাপার্টমেন্ট আছে। তার কোনও একটায় তাকে থাকতে হবে। তার জন্য গাড়ি, শোফার, দু'টো সারাক্ষণের কাজের লোক, রান্নার লোক থাকবে। সব খরচ কোম্পানির। এ ছাড়া বছরে দু'লাখ টাকা নগদ।

গুপ্তা বলেছে, 'সব ফাইনাল হয়ে গেল। চল, এবার ডিনারটা সেরে তোমার খুবসুরতিটা টেস্ট করি।'

তনিমা বুঝতে পারছিল, গাড়ি ফ্ল্যাট অঢেল টাকা—এসব এমনি এমনি হয় না। গুপ্তার সাফ কথা, তুমি আমাকে তোমার পরমাশ্চর্য শরীরটা দাও, আমি তোমাকে সাত ভুবনের ওপার থেকে স্বপ্ন পেড়ে এনে দেব। অর্থাৎ তুমি আমাকে কিছু দাও, আমি তোমাকে কিছু দিই। পরিষ্কার লেনদেন। বিনিময় ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই মেলে না।

তার শরীর তো আর পবিত্র গঙ্গাজল নয়। মহেশ আগেই তা নষ্ট করে দিয়েছে। গুপ্তা না হয় আরেকবার নষ্ট করবে। স্বপ্নপূরণের জন্য আরও কত বার যে গায়ে ক্লেদ মাখতে হবে, কে জানে।

তনিমার আড়ষ্টতা ক্রমশ কেটে আসছিল। হঠাৎ মহেশের কথা মনে পড়ে গেছে। লোকটাকে সে ঘৃণা করে, কিন্তু এটা তো ঠিক, মহেশ না নিয়ে এলে গুপ্তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারত না। কৃতজ্ঞতার একটু তলানি তখনও তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। গুপ্তা মহেশকে ভাগিয়ে দিয়েছে ঠিকই, তবু তনিমা বলেছে, 'ওর ব্যাপারে কি কিছুই করা যায় না?'

গুপ্তা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত ঝাঁকিয়ে প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে। 'ওই ব্লাডিটা কী পিকচার বানাবে! ইন্ডাস্ট্রির পুরা খবর আমি রাখি। শালা আট বছর অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টরি করছে। তার বেশি ক্যালি ওর নেই। ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ছবি করতে দিলে পটি করে ফেলবে। আমার টাকাও বরবাদ। ফরগেট হিম। ও তোমার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। টেন, ফিফটিন থাউজেন্ড দিয়ে দেব। দ্যাটস অল। ফরগেট হিম।'

তনিমার আর কিছু বলার ছিল না। সেই রাতেই মহেশ তার জীবন থেকে চিরকালের মতো বাতিল হয়ে গেছে।

গুপ্তার কোম্পানি তনিমাকে নিয়ে দু'বছরে দু'টো ছবি করেছে। এই সময় তার 'গৌরী' নামটা পালটে তনিমা করা হয়েছিল। প্রচুর পাবলিসিটিও দিয়েছিল ওরা। খবরের কাগজে, টিভিতে, ঝকঝকে সিনেমা ম্যাগাজিনগুলোতে, শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে রঙিন পোস্টারে, কিওস্কে শুধুই তার মুখ। এমনকি হিন্দি আর সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্মের স্টাইলে শহরের নানা জায়গায় তার বিরাট বিরাট ক'টা কাট-আউটও লাগিয়ে দিয়েছে।

এত সব করেও একটা ছবি ডাহা ফ্লপ। অন্যটা মোটামুটি। যা টাকা ঢালা হয়েছিল তার অনেকটাই উঠে এল। ছবি চালিয়ে চালিয়ে কয়েক বছরে বাকিটাও উঠবে, এমনই আশা।

গুপ্তা লোকটা ঝানু প্রডিউসারদের মতো হিসেবি নয়। লাভ-লোকসানের অঙ্ক কষে সবসময় বাঁধা রাস্তায় চলতে পছন্দ করে না। বরং নতুনদের, বিশেষ করে আনকোরা নায়িকাদের নিয়ে ফাটকা খেলতে ভালোবাসে। নতুন মেয়েদের ওপর টাকা লাগিয়ে সব ছবিতেই টাকা জলে যায়নি। কোনও কোনও ছবি সুপার হিটও হয়েছে। বেশ ক'টি নায়িকা, যারা পরে স্টার হয়েছে, তাদের গুপ্তাই প্রথম ব্রেক দিয়েছিল।

দু'বছর পর তনিমা আর নতুন ছিল না। তার সম্বন্ধে গুপ্তার আগ্রহ ততদিনে ঝিমিয়ে এসেছে। সে টের পাচ্ছিল, লোকটা 'ফ্রেশ মুখ' খুঁজছে। তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

গুপ্তা একদিন বলেছিল, 'তোমার এগ্রিমেন্ট শেষ হয়ে গেছে। 'রিলিজ' নিতে পার।'

তনিমা তখন আর আটাগুড়ির সেই সরল, জড়সড়, ভীরু মেয়েটি নেই। অঙ্কের হিসেবে তার বয়স বেড়েছে দু'বছর। কিন্তু অভিজ্ঞতা? সেদিক থেকে সে তখন একজন ঝানু নাগরিক। এই শহরের ঘোঁতঘাত, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নানা অন্ধিসন্ধি তার জানা হয়ে গেছে।

গুপ্তা 'রিলিজ' দিয়েছে বলে সে মহাসমুদ্রে গিয়ে পড়েনি। দু'বছরে যে টাকাটা সে পেয়েছে তার প্রায় সবটাই ব্যাংকে জমা রয়েছে। টাকা একটা বিরাট শক্তি। তা ছাড়া, এর ভেতর ফিল্ম লাইনের অনেকের সঙ্গেই তার আলাপ টালাপ হয়েছে। ওদের একজনকে ধরে ল্যান্সডাউন রোডে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে উঠে গিয়েছিল তনিমা।

জমকালো পাবলিসিটি ছাড়া তার ছবি দু'টো কোনও রকম সাড়া জাগাতে পারেনি। তবে বাংলা ইংরেজি কাগজগুলো তনিমার রূপের প্রচুর মহিমাকীর্তন করেছে। 'স্টানিং বিউটি', 'ম্যাজিক্যাল চার্ম', 'জাদুকরী সৌন্দর্য', 'বাংলা ফিল্মের নতুন পরী' ইত্যাদি। শুধু রূপের স্তুতিই নয়, অভিনয়েরও গুণগান করা হয়েছে।' বাংলা ছবিতে বহুকাল পর একজন দক্ষ অভিনেত্রীকে পাওয়া গেল।' কিংবা 'তনিমার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।' কেউ কেউ এমনও লিখেছে, গেঁজে না গেলে তনিমা অনেক দূর উঠবে। স্কাই ইজ দা লিমিট।

ছবি সেভাবে না চললেও অন্য প্রডিউসারদের নজর এসে পড়েছিল তনিমার ওপর। ল্যান্সডাউনের ফ্ল্যাটে নায়িকার রোলের অফার নিয়ে তাদের আনাগোনাও শুরু হয়েছিল। দু-একজনের সঙ্গে এগ্রিমেন্টও হয়ে গেল। এরা সকলেই নাম-করা প্রযোজক। আগে অনেক হিট ছবি দিয়েছে।

মহেশ তার সামনে একটা ছোট মই দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর গুপ্তা আরও উঁচু একটা সিঁড়ি এনে দিল। ল্যান্সডাউনে আসার পর আরও লম্বা লম্বা আকাশছোঁয়া সোপানের সারি এসে হাজির হতে লাগল। এতকাল তনিমা যা চেয়ে এসেছে, পায়ের সামনে তা পেয়ে যাচ্ছিল। এবার মসৃণ গতিতে ধাপ বেয়ে বেয়ে শুধু ওপরে ওঠা।

কিন্তু সমস্যাটা দেখা দিল অন্য দিক থেকে। এই সুবিশাল শহরে হাঙরেরা চারদিকে হাঁ-মুখ মেলে আছে। মাথার ওপর পুরুষ নেই, এমন একটা অরক্ষিত

যুবতী মেয়ের পক্ষে একা একা এখানে বেঁচে থাকা কত যে কঠিন, হাড়ে-মজ্জায় সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। একটা মাঝবয়সি শক্তপোক্ত কাজের মেয়েমানুষ রাখল তনিমা, দিনরাতের জন্য। সে ঘরের কাজও করবে। রাতে তনিমাকে পাহারাও দেবে। একটা রাগী অ্যালসেশিয়ানও পোষা হল। কিন্তু কুকুর আর পাহারাদারনীর সাধ্য কী, হাঙরদের ঠেকিয়ে রাখে!

অগত্যা নিরাপত্তার জন্য যে যে প্রডিউসার বা ডিরেক্টরের ছবিতে কাজ করেছে তাদের সাহায্য না নিয়ে উপায় ছিল না। এদের সবাই যে মেয়ে দেখলে ল্যা ল্যা করে হামড়ে পড়ে তা নয়। এরা কেউ কেউ তার সিকিউরিটির ব্যবস্থাটা জোরদার করে দিত। বাকি সবাই নিজেদের গোপন ফ্ল্যাটে নিয়ে তুলত। গুপ্তার মতো। কতবার যে সে হাত বদল হয়েছে, কত জনের সঙ্গে যে তাকে রাত কাটাতে হয়েছে!

মনে পড়ে, মহেশের সঙ্গে সেই যে বেরিয়ে এসেছিল, তারপর মা-বাবা কেউ তার খোঁজ নেননি। তার সিনেমায় নামার খবর পৃথিবীর সবাই জেনে গেছে। মা-বাবার কানেও কি পৌঁছয়নি? কিন্তু যে মেয়ে বংশের মুখে চুন কালি মাখিয়ে বেরিয়ে গেছে, বাড়ির লোকেরা তার সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখতে চায়নি। সে জানত, আটাগুড়ির লাহিড়ি বংশ থেকে তার নাম চিরকালের মতো খারিজ হয়ে গেছে। সে নিজেও যে মা-বাবা-ভাইবোনদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসবে বা চিঠি লিখবে, তেমন সাহস হয়নি। কখনও কখনও, যেদিন শুটিং থাকত না, নির্জন দুপুরে কি সন্ধ্যায় একা বসে থাকতে থাকতে বুক ভারী হয়ে উঠত তার, দু'চোখ জলে ভরে যেত।

আটাগুড়ি থেকে চলে আসার চার বছর বাদে তনিমার একটা ছবি 'মনের মানুষ' দুর্দান্ত হিট করল। একেবারে গোল্ডেন জুবিলি। লহমায় বাংলা সিনেমার স্টার হয়ে গেল সে। তারপর হিটের পর হিট। স্টার থেকে তার মেগাস্টার হয়ে ওঠা। নায়িকা থেকে মহানায়িকা। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের সবার এক আর্জি, নতুন ছবির জন্য ডেট চাই। তাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেল।

ঠিক এই সময় তনিমার জীবনে দেবনাথের আবির্ভাব। একেবারে ঝড়ের গতিতে।

ছ'ফিটের বেশি হাইট, চওড়া মাংসল কাঁধ, চৌকো ধরনের মুখ, দৃঢ় থুতনি, চোখের বাদামি তারা, পরনে দামি সাফারি স্যুট, হাতে বিদেশি সিগারেটের টিন। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, লোকটার ভেতর প্রচণ্ড বুনো পৌরুষ ঠাসা রয়েছে। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করলে, বুক শিরশির করে। লোকটার মধ্যে সেই সঙ্গে রয়েছে

তীব্র আকর্ষণ। তার চেহারায়, কথাবার্তায় কোথাও একটা অদৃশ্য চুম্বক বসানো। সেটা ক্রমাগত টানতে থাকে।

নর্ত বেঙ্গলে আর আসামে দেবনাথদের আট-দশটা চা বাগান ছিল। পারিবারিক ব্যবসা। ভাইদের কাছে নিজের শেয়ার বেচে এক কোটিরও বেশি টাকা নিয়ে সোজা চলে এসেছিল কলকাতায়। কী ব্যাপার? না, ফিল্মে তনিমাকে দেখার পর সে পাগল হয়ে গেছে। সে ছবি প্রডিউস করবে এবং তার ছবিতে তনিমাকে হিরোইনের রোলে চাই-ই চাই।

তনিমার তখন নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। রোজ, এমনকি ছুটির দিনেও দু'শিফটে কাজ করছে। কোনও কোনও দিন তিন শিফটেও। সকাল থেকে শুধু শুটিং আর শুটিং।

দেড় বছরের মধ্যে একটা ডেটও তাঁর ফাঁকা ছিল না। অন্য প্রডিউসাররা সব ভাগাভাগি করে নিয়েছে। তনিমাকে নিয়ে ছবি করতে হলে দেবনাথকে দেড় বছর তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতে হবে। কিন্তু অত ধৈর্য তার নেই। একরকম জোর করেই ডেট আদায় করে নিয়েছে সে। অন্য প্রডিউসাররা এই নিয়ে প্রচুর ঝঞ্ঝাট করেছে কিন্তু দেবনাথ গ্রাহ্য করেনি। লোকটা মারাত্মক বেপরোয়া। তার পকেটে সর্বক্ষণ একটা বেঁটে সাইজের স্প্যানিশ রিভলভার থাকত (এখনও থাকে)। ফলে বাকি প্রযোজকরা একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল। কেউ আর ডেট নিয়ে ট্যাঁ-ফোঁ করেনি। কোন কৌশলে এই ম্যাজিকটা সম্ভব হয়েছিল, তনিমার জানা নেই। তবে এটা বোঝা গিয়েছিল দেবনাথ যা ঠিক করে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না।

শুধু ডেটই ছিনিয়ে নেয়নি, ছবি শুরু করার কয়েক দিনের ভেতর তনিমাকে দখল করে নিয়েছিল দেবনাথ। প্রথম রাতেই টের পাওয়া গেছে, লোকটার সারা শরীর জুড়ে শুধু খাই খাই। খিদে কি তনিমারও কম? এর আগে তার বিছানায় যারা উঠেছে, তাদের বেশির ভাগই মেদের ঢিবি, কিন্তু ভেতরটা একেবারে ফোঁপরা। বাকিগুলো লিকলিকে গিরগিটি—দুর্বল, হাঁফ-ধরা।

জীবনে সেই প্রথম একজন শক্তিশালী পুরুষকে পেয়েছিল তনিমা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল দেবনাথের খাব খাব ভাবটা এতই প্রবল যে একটিমাত্র নারীতেই তার শরীরের আগুন নেভে না। সিনেমার লোকেরাই তনিমাকে খবর দিয়ে যাচ্ছিল, অল্পবয়সী কোনও ছুকরি আর্টিস্টকে নিয়ে দেবনাথ অমুক হোটেলে ঘণ্টাতিনেক কাটিয়ে এসেছে। এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাত না তনিমা। সে কি পতিব্রতা, ঘরের লক্ষ্মীমার্কা বউ যে কেঁদে কেটে ভাসিয়ে দেবে? তার শরীরটা নিয়েও লম্পটেরা কম খেলেছে?

এটা তো ঠিক, স্টার হবার পরও নিরাপদ ছিল না তনিমা। বিজনেস ম্যাগনেট, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, পলিটিক্যাল পার্টির লিডার—এমন অনেকেই চাইত, তাদের কোনও গোপন অ্যাপার্টমেন্টে সপ্তাহে দু-একদিন রাতের দিকে তনিমা যাক। তারাও লুকিয়ে লুকিয়ে অভিসারে যাবে। গ্ল্যামার যত বাড়ছিল, তাকে যারা ছিঁড়ে খেতে চায় তাদের সংখ্যাটাও পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছিল। কোন প্রক্রিয়ায় কে জানে, এইসব শকুনের পালের হাত থেকে তাকে আগলে আগলে রেখেছে দেবনাথ। তখন থেকেই তার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে তনিমা।

মনে পড়ে, এই সময় অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরুলেই মিডিয়ার লোক। পাপারাজিদের ক্যামেরায় মুহুর্মুহু আলোর ঝলক। কত নতুন নতুন ফিল্মমেকার—তাদের দু-একজন পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে—তনিমাকে নিয়ে ডকু-ফিচার করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। ব্যস্ত শুটিং শিডিউলের ভেতর থেকে সময় বার করে ক'টা ডেটের জন্য তাদের যে কত কাকুতি মিনতি! কিন্তু ডেট দেওয়া যায়নি।

আরও দু'টো ব্যাপার স্পষ্ট মনে আছে। প্যারালাল সিনেমার এক নাম-করা ডিরেক্টর মণীশ দস্তিদার (এরা টালিগঞ্জের পুরনো ট্র্যাডিশনাল ফিল্মগুলোকে বস্তাপচা, যাত্রামার্কা, বাজে সেন্টিমেন্টাল বলে উঠতে বসতে বাপান্ত করে) তার কাছে এসে হাজির। অভিপ্রায়, তার ছবিতে নায়িকার রোলটা করে দিতে হবে।

তনিমা প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু ততদিনে দেবনাথ তার ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড। কোন ডিরেক্টরের ছবিতে তনিমা সাইন করবে, কাকে ক'টা ডেট দেবে, কোন পার্টিতে গিয়ে কতক্ষণ কাটাবে, কার কাছে পাঁচটার বেশি বাক্য মুখ থেকে বার করবে না—সব ছকে দিত সে। দেবনাথই বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে রাজি করিয়েছিল। যুক্তিটা এইরকম। তনিমা যে-সব ছবিতে অভিনয় করে সেগুলো যারা দেখে তাদের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ হল আম জনতা, আগাপাশতলা গোলা দর্শক। প্যারালালওলাদের ছবিতে নামলে নাক-উঁচুদের নজরে পড়বে, কাগজে পেল্লায় পেল্লায় রিভিউ বেরুবে, দিল্লি থেকে অ্যাওয়ার্ড পাওয়ারও সম্ভাবনা। শুধু টাকাই সব নয়, গ্ল্যামারের পাশাপাশি সরকারি পুরস্কারটা দরকার। সেটা আর্টিস্টদের ওজন বাড়িয়ে দেয়। উষ্ণীষে লাগিয়ে দেয় ঝলমলে পালক।

মণীশ দস্তিদারের ছবিতে ক্যামেরার কিছু কসরত ছিল। চরিত্রগুলোর, বিশেষ করে তনিমার মুখচোখ বাঁকিয়ে চুরিয়ে অনেকবার দেখানো হয়েছে। এই অস্বাভাবিক মুখ নাকি ভেতরকার আসল সত্তার প্রতিচ্ছবি।

কম করে কুড়ি বার নায়ককে চুমু খেতে হয়েছে। নোংরা নোংরা সংলাপ বলতে হয়েছে। কথায় কথায় অশ্লীল বেড-সিন। এগুলো নাকি জীবনের রিয়ালিটি। এর

মধ্যে নাকি অস্তিত্বের সংকট ফোটানো হয়েছে। পরিচালক ছবিতে ঠিক কী যে বলতে চান, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি তনিমা। একটাই বাঁচোয়া, সেনসর আঠারোটা চুম্বন দৃশ্য, সাতটা শয্যাদৃশ্য আর প্রচুর ডায়ালগ কেটে দিয়েছিল।

প্রায় ফাঁকা হলে এক সপ্তাহ চলার পর ছবিটা উঠে যায়। তখন ফিল্মপিছু তার পারিশ্রমিক ছিল আড়াই লাখ। মণীশ দস্তিদার দিয়েছিল পঁচিশ হাজার। টাকা না পাক, লাভ হয়েছিল অন্য দিক থেকে। প্রতিটি কাগজ তার অভিনয়ের ঢালাও প্রশংসা করেছে। চারদিকে স্তুতির বান ডেকে গিয়েছিল। ছিল আম জনতার চোখের মণি। এবার জাতে উঠে গেল। পাক্কা একটা খবরও পেয়েছিল তনিমা। বেস্ট অ্যাকট্রেস অ্যাওয়ার্ডটা তারই পাওয়ার কথা। একে ওকে ধরে সাউথ ইন্ডিয়ার এক হিরোইন নাকি সেটা বাগিয়ে নেয়। এই সব অ্যাওয়ার্ডের পেছনে নাকি অনেক চাতুরি, অনেক রকম খেলা থাকে।

প্যারালাল সিনেমাওলাদের কাছ থেকে পরে অনেক অফার এসেছিল। তনিমা সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছে। মণীশের ছবিটাই তার প্রথম এবং শেষ ছবি।

দ্বিতীয় ব্যাপারটা এই রকম। একদিন স্টুডিওতে লাঞ্চ ব্রেকে একটি যুবক তার সঙ্গে দেখা করেছিল। নাম সন্দীপ বসু। বুদ্ধিদীপ্ত, ঝকঝকে চেহারা। তনিমারই বয়সী, দু-এক বছরের বড়ও হতে পারে। জানিয়েছিল সে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে। মাইক্রোবায়োলজিস্ট। কলকাতায় সল্ট লেকেও তাদের বাড়ি আছে। সেখানে থাকেন তার মা বাবা ঠাকুরদা ঠাকুমা এবং এক ভাই। বছরে দু'বার এসে পনেরো দিন পনেরো দিন করে একমাস বাড়িতে কাটিয়ে যায়। কলকাতায় ফিরে আসার চেষ্টা করছে কিন্তু যেমনটা চায় সেরকম চাকরি টাকরি এখানে নেই। যদি পায় একটা দিনও সে দেরি করবে না।

আমেরিকায় থাকলেও সন্দীপ আদ্যোপান্ত বাঙালি। বাংলা নাটক, বাংলা ছবি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, গঙ্গা কি পদ্মার ইলিশ, আদি বাড়ি একদা পূর্ব বাংলায় হওয়ায় রক্তে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব—এ-সব ছেড়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে পৃথিবীর আরেক গোলার্ধে পড়ে থাকতে ভালো লাগে না। ছুটিতে বাড়ি এসে যতগুলো পারে বাংলা নাটক আর ছবি দেখে। রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুলগীতি অতুলপ্রসাদ শচীনদেব ধনঞ্জয় জগন্ময় হেমন্ত অখিলবন্ধু শ্যামল থেকে একেবারে আনকোরাদের গাদা গাদা গানের ক্যাসেট কেনে। ঠেসে ভাপা ইলিশ, চিতলের পেটি, পাবদা কি তেল-কই খায়। ফুটবলের সিজন হলে ময়দানে দৌড়য়। আসলে তার মধ্যে যে বাঙালিয়ানাটা রয়েছে, মাঝে মাঝে দেশে এসে সেটা নতুন করে ঝালিয়ে নিয়ে যায়।

আচমকা স্টুডিওতে যাবার কারণটা জানিয়ে দিয়েছিল সন্দীপ। সেবার কলকাতায় এসে সিনেমা হলে তনিমার নতুন রিলিজ হওয়া একটা ছবি দেখে এমনই মজে যায় যে তাকে সামনাসামনি দেখতে এবং তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছা হয়েছিল।

তনিমা হেসে হেসে বলেছে, 'আপনি যে হঠাৎ চলে এলেন, স্টুডিওর দারোয়ানরা আমার সঙ্গে দেখা করতে নাও দিতে পারত।'

সন্দীপ তক্ষুনি সায় দিয়েছে, 'তা পারত। তবে আমেরিকা থেকে আসছি শুনে আটকায়নি। সোজা আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আমেরিকা নামটার মধ্যে ম্যাজিক আছে—না কি বলেন?'

উত্তর না দিয়ে তনিমা বলেছে, 'আজ যদি স্টুডিওতে শুটিং না থাকত, তা হলে তো আসতাম না। আপনার এতটা ছোটাছুটিই মিনিংলেস হয়ে যেত।'

'একটা চান্স নিয়েছিলাম। দেখা না হলে কী করতাম জানেন?'

'কী?'

'খুব সহজে হাল ছাড়তাম না। স্টুডিও থেকে আপনার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে সেখানে ছুটতাম। হেভেন অর আর্থ, যেখানে হোক, আপনাকে আজ আমি খুঁজে বার করতামই। ইন ফ্যাক্ট, আপনার নতুন ছবিটা দেখে আমি এতটাই চার্মড যে টাটকা টাটকা অভিনন্দন না জানিয়ে পারছিলাম না।'

'আপনার যে আমার অভিনয় ভালো লেগেছে সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সন্দীপ বলেছে, 'আগেও কলকাতায় এসে আপনার ছবি দেখেছি। 'জোয়ার ভাঁটা, 'স্রোত', 'ঘর সংসার', 'প্রেমের আগুন', এমনি আরও কয়েকটা।' একটু থেমে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করেছে, 'যদি রাগ না করেন, একটা কথা বলব?'

তনিমা বলেছে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'যে নতুন ছবিটা এবার দেখলাম সেটাতে আপনার অ্যাক্টিং একসেলেন্ট। কিন্তু ছবিটার স্টোরি, ডিরেকশান—সব রাবিশ।'

তনিমা উত্তর দেয় নি।

সন্দীপ থামে নি, 'বাংলা কমার্শিয়াল পিকচারের স্ট্যান্ডার্ড খুব 'ফল' করেছে। থার্ড ক্লাস হিন্দি ছবির কপি। ভালগার। ডার্টি। নইলে টোটালি যাত্রামার্কা। এরা ফিল্ম ব্যাপারটা বোঝে বলে মনে হয় না।'

বিব্রত তনিমার মুখে আবছা একটু হাসি ফুটে উঠেছে। সে উত্তর দেয় নি।

দেবনাথ তনিমার সারাক্ষণের সঙ্গী। গায়ের চামড়ার মতো সেঁটে থাকে। সে মেক-আপ রুমেই রয়েছে। এতক্ষণ ঠোঁট টিপে পলকহীন সন্দীপের দিকে তাকিয়ে

ছিল। এবার মুখ খুলেছে, 'আমাদের কিছু করার নেই। প্রডিউসাররা এই সব চাইছে। শুধু হিন্দিই না, সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাকশন ফিল্ম, বাংলাদেশের লক্কড় ছবি ফ্রেমকে ফ্রেম ঝেড়ে ছবি বানাচ্ছে। এর বেশি আর কী আশা করতে পারেন?'

মেক-আপ রুমে দেবনাথকে সন্দীপ দেখেছে ঠিকই, তবে তাকে ভালো করে লক্ষ করে নি। এবার তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেছে, 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না—'

দেবনাথ কিছু বলার আগে তনিমা এভাবে তার পরিচয় দিয়েছিল। দেবনাথ তার বন্ধু।

নমস্কার প্রতি-নমস্কার ইত্যাদি সৌজন্য প্রকাশের পর একটু আগের কথার সুতো ধরে সন্দীপ বলছে, 'আপনি ফিল্মের ব্যাপারে যা বলছিলেন, আমি সেই রকমই শুনেছি। আগে চমৎকার সব বাংলা ছবি হত। ফ্যামিলি ড্রামা, ডিটেকটিভ স্টোরিকে 'বেস' করে ছবি, কমেডি ফিল্ম, চিলড্রেন্স ফিল্ম। সে-সব আর দেখাই যায় না। বাংলা সাহিত্যে কি গল্পের আকাল গড়ে গেল! স্যুটেবল স্টোরি বেছে নিয়ে ছবি করা হয় না কেন?'

'হয় না, তার কারণ এখনকার প্রডিউসাররা বেশির ভাগই আকাট মাল। বাপের জন্মে সাহিত্য টাহিত্যের নামই শোনে নি। শুনলেও পরোয়া করে না। কোমর ঝাঁকিয়ে পি টি টাইপের পাঁচটা ড্যান্স, দশটা গানা, সাতটা ফাইট সিন, বেডসিন, দশ মিনিট পর পর আধ-ন্যাংটো হিরোইন কি ভ্যাম্প, রিভেঞ্জ, ভেনডেটা, এন্ডে মধুর মিলন। এই সব পাঞ্চ করে একটা ফরমুলা বানানো হয়েছে। আর তাই দিয়ে একের পর এক ছবি টালিগঞ্জের স্টুডিও থেকে হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসছে। ভাল বাংলা ফিল্মের ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। তার আর কোনও আশা নেই। বিলিতি হুইস্কির বদলে দর্শককে এখন তাড়িই গিলে যেতে হবে।' না থেমে একদমে বলে গিয়েছিল দেবনাথ।

তনিমা হতবাক। চোখ বড় করে দেবনাথকে দেখেই যাচ্ছিল সে। এই লোকটাই টালিগঞ্জের চলতি ফরমুলায় দু দু'টো ছবি বানিয়ে বাংলা ফিল্মের অন্তর্জলি যাত্রায় যে খানিকটা সাহায্য করেছিল, তার কথা শুনে তা বোঝার উপায় নেই।

সন্দীপ ফের তনিমার দিকে ফিরে বলেছে, 'ছবি করার আগে স্টোরি ক্যারেক্টার স্ক্রিপ্ট সব দেখে নেবেন। বাজে ফিল্মে নেমে নিজের ট্যালেন্ট নষ্ট করার মানে হয় না।'

তনিমা হাসতে হাসতে লঘু সুরে বলেছে, 'আপনি যা বললেন সেই ধরনের স্টোরি ক্যারেক্টার পেতে হলে আমার চুল পেকে যাবে। ফিল্ম করা আর হয়ে উঠবে না।'

আরও কিছুক্ষণ গল্প টল্প করে চলে গিয়েছিল সন্দীপ। তারপর দেবনাথ বলেছিল, 'এতদিন বঙ্গবাসীরা তোমার ওপর হামলে পড়ছিল।' একটা মুখ-খিস্তি করে বলেছে, 'এবার একজন আমেরিকান ফ্যান পেলে। এই শালা মনে হচ্ছে ফিউচারে জ্বালাবে।'

দেবনাথ যাই বলুক, সন্দীপকে ভীষণ ভালো লেগেছিল তনিমার। মনে হয়নি সে মতলববাজ, কোনও রকম অভিসন্ধি তার মধ্যে আছে। বহুদূরের কালিফোর্নিয়ায় সে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিন্তু খুবই সরল, উচ্ছ্বাসপ্রবণ। বলেছে, 'বাংলা ফিল্মের আজকের হালের জন্যে ওর দুশ্চিন্তাটা কিন্তু খুব জেনুইন।'

সেই যে সন্দীপ স্টুডিওতে ছুটে গিয়েছিল তারপর যখনই কলকাতায় এসেছে তনিমার সঙ্গে দেখা করেছে। তার জন্য আমেরিকা থেকে দারুণ দারুণ গিফট নিয়ে আসত। এখনও আনে। কিছু নিলে কিছু দিতে হয়। তনিমাও তাকে কারুকাজ-করা গরদের পাঞ্জাবি, পাঠান স্যুট কি ধাক্কাপাড় ধুতি দিয়েছে। তবে সন্দীপ সব চেয়ে খুশি হয়, তার পুরনো বা নতুন ছবির ক্যাসেট পেলে। কলকাতায় ক'দিনের জন্যই বা আসা হয়! আমেরিকায় ফিরে গেলেও যোগাযোগটা কেটে যায় না। দু-চার দিন পর পরই সে ফোন করেছে। এখনও করে।

কলকাতায় এলে শুধু স্টুডিওতেই দেখা হত না, নিজের ফ্ল্যাটে নেমন্তন্ন করে সন্দীপকে ডিনার খাইয়েছে তনিমা, লাঞ্চ খাইয়েছে, চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছে।

এতবার দেখা হওয়া, এত মেলামেশা কিন্তু কখনও তনিমার মনে হয়নি, সন্দীপের মধ্যে একটা জন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওত পেতে আছে। মহেশের সঙ্গে কলকাতায় ট্রেনে ওঠার পর থেকে পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণা একেবারে পালটে গেছে। যার দিকেই তাকায় তার মুখ আর মানুষের মুখ থাকে না। লহমায় সেটা চিতা কি হায়েনার মুখ হয়ে যায়। কিন্তু কখনও তনিমার মনে হয়নি, সন্দীপের মুখটা বদলে যেতে পারে। কেমন যেন আলাভোলা, নিষ্পাপ। কখনও কখনও কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। পৃথিবীর আর সবার থেকে সে আলাদা। এমনকি দেবনাথের মতো ঘাগু লোকও স্বীকার করে, 'না, ছেলেটা খচ্চর নয়।'

ক্রমে জানা গিয়েছিল, সন্দীপের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সেটা দেড় বছরের বেশি টেকেনি। স্ত্রী জয়িতা তারই এক বন্ধুর সঙ্গে চলে গিয়েছিল। ওরা আমেরিকাতেই থাকে। তবে কালিফোর্নিয়ায় নয়, নিউ জার্সিতে।

সন্দীপ আর বিয়ে-টিয়ে করেনি। কালিফোর্নিয়াতে সে একাই থাকে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। জয়িতার সঙ্গে তার নাকি প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল। যাকে সে ভালোবেসেছিল সে তাকে অক্লেশে ফেলে চলে গেছে। জয়িতার সঙ্গে সম্পর্কটা চুকেবুকে যাবার পর অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে তার কী ধারণা? সেকি তাদের আদৌ বিশ্বাস করে? এ-সব প্রশ্ন তাকে কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি।

তবে বেশ কয়েকবার তনিমা বলেছে, 'অত দূরে একা একা থাকো। ফের বিয়ে করলে তো পার। লাইফে একজন ভালো সঙ্গী দরকার।' বলেই জিভে যেন কামড় খেয়েছে। তার নিজেরও তো বিয়ে হয়নি। অবশ্য একজন সঙ্গী রয়েছে। কিন্তু দেবনাথ কী ধরনের সঙ্গী, তার চেয়ে ভালো আর কে জানে।

সন্দীপ জবাবটা বরাবরই এড়িয়ে গেছে। বলেছে, 'দেখা যাক—'

কখনও কখনও তনিমার মনে হয়েছে, তার প্রতি সন্দীপের একটা চোরা টান আছে। নইলে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বার বার কলকাতায় তার কাছে চলে আসবে কেন? কিন্তু সেই গোপন ব্যাপারটা গোপনই থেকে গেছে। কোনও দিন মুখ ফুটে জানায়নি সন্দীপ।

কোনও কোনও বিজন মুহূর্তে তনিমা ভেবেছে, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কবে সন্দীপ আসবে, সে জন্য সে-ও কী কম উন্মুখ হয়ে থাকে? সন্দীপকে কাছাকাছি দেখলে তার বুকেও তো উতল হাওয়া বয়ে যায়। সন্দীপ যদি কোনও দিন সেভাবে ডাকে, সে কি সিনেমার গ্ল্যামার, লক্ষ লক্ষ ফ্যানের উন্মাদনা, মিডিয়ায় তাকে নিয়ে তুমুল মাতামাতি— এসব ছেড়েছুড়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যেতে পারবে? পরক্ষণে খেয়াল হয়েছে, ডাকটাই তো আসেনি। যখন আসবে, যদি আদৌ আসে, তখন না হয় চিন্তা করা যাবে।

সন্দীপ তো পরি৺ায়ী পাখির মতো আসে, যায়। এদিকে তনিমার ফিল্মের কাজ পুরোদমেই চলছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার, যখন তার বেশির ভাগ ছবিই হিট বা সুপারহিট, দেবনাথের ছবিটা ফ্লপ করে গেল। সে জন্য দায়ী দেবনাথ নিজে এবং তার গোঁয়ার্তুমি। ছবিতে টাকা ঢেলেছে, তাই তার কথাই শেষ কথা। সে গল্প লিখেছে, চিত্রনাট্য লিখেছে। কে ডিরেক্টর হবে, কে ক্যামেরাম্যান, কে মিউজিক ডিরেক্টর, কে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট —সব সে-ই ঠিক করেছে। ছবিতে কোন কোন আর্টিস্টকে নেওয়া হবে, ক'টা গান থাকবে, ক'টা ফাইট, ক'টা চেজ বা পশ্চাদ্ধাবন দৃশ্য রাখতে হবে, আউটডোর শুটিংয়ের জন্য কোন কোন লোকেশনে ইউনিট যাবে— সমস্ত ছকটাই তার করে দেওয়া। যে সিনেমা তৈরির অ আ ক খ জানে না, অথচ নিজেকে মনে করে সবজান্তা, মহাজ্ঞানী— তার ছবির ফলাফল তো এমনটাই হবে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা স্রেফ জলে চলে গেল।

কিন্তু পিছু হটার পাত্র নয় দেবনাথ। তার মাথায় এক ধরনের নাছোড় হঠকারিতা রয়েছে। পঁয়তাল্লিশ লাখ গেছে তো কী হয়েছে, তার হাতে তখনও পঞ্চান্ন লাখের মতো আছে। আগেরটার মতোই নিজস্ব স্টাইলে তার দু'নম্বর এবং শেষ ছবিটি করেছিল। সেটার রেজাল্টও আলাদা কিছু হল না। প্রথমটার মতো ওটাও ফ্লপ।

প্রায় এক কোটি টাকা খুইয়ে দেবনাথ যে নর্থ বেঙ্গলে ফিরে যাবে, সেটা কিন্তু করল না। পাস্ট ইজ পাস্ট। সে সম্বন্ধে তার লেশমাত্র আগ্রহ নেই। গায়ের চামড়ার মতো সে তনিমার সঙ্গে সেঁটে রইল। তারপর তো বেশ ক'টা বছর কেটে গেছে।

বয়স বাড়লে যা হয়, চিত্রতারকাদের গ্ল্যামার ফিকে হতে শুরু করে। ওই যে কথা আছে না— 'দেহপট সনে নট সকলই হারায়—' সেটাই সার সত্য। তবে এখনও তনিমা অতীত হয়ে যায়নি। দেহপট আগের মতো না থাকলেও এখনও অনেকটাই অটুট রয়েছে। দুপুরের গনগনে আঁচ হয়তো নেই, তবে সূর্যরশ্মি বিলীন হতে কিছু দেরি আছে। এখনও তার যথেষ্ট গ্ল্যামার, প্রচুর জনপ্রিয়তা, মিডিয়া তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

আর ঠিক এই সময় দেবনাথ এনে হাজির করল সুবিমল রাহাদের। তনিমাকে নির্বাচনে নামতে হবে। সিনেমা থেকে রাজনীতি। জীবনের এক পর্ব থেকে আরেক পর্ব।

আটাগুড়ির এক সাদাসিধে, অতি সাধারণ স্কুল টিচারের মেয়ের জীবনে মাত্র ক'টা বছরে কত কী-ই না ঘটে গেল। অ্যাডভেঞ্চার, চড়া সুরে বাঁধা জমজমাট নাটক, চমকের পর চমক। দুরন্ত গতির রুদ্ধশ্বাস থ্রিলারেও বুঝিবা এত উত্তেজনা থাকে না।......

.....খোলা জানালা দিয়ে দূরমনস্কর মতো বাইরে তাকিয়ে ছিল তনিমা। ঘুমন্ত মহানগর আরও নিঝুম হয়ে গেছে। রাস্তায় একটা গাড়িও চোখে পড়ছে না। মানুষজন তো নেই-ই। চাঁদ এখন আকাশের মাঝ-মধ্যিখানে। জ্যোৎস্নায় থই থই করছে চারদিক।

তনিমা কিন্তু কিছুই দেখছিল না। নির্বাচনের ব্যাপারটা তার মাথায় বসে গেছে। ইলেকশনে জিততে পারলে সে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে পার্লামেন্টে যাবে। এ-সব যত ভাবছে, অদ্ভুত শিহরন অনুভব করছে।

একসময় হঠাৎ তার খেয়াল হল, ঘুমে দুই চোখ জুড়ে আসছে। জানালার পাশ থেকে ফিরে আসতে আসতে চোখে পড়ল, দুই উরু দু'দিকে ছেতরে দিয়ে আগের মতোই অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেবনাথ। গালের কশ বেয়ে লাল গড়িয়ে বালিশ অনেকটাই ভিজিয়ে দিয়েছে। নাকের ভেতর থেকে সরু মোটা নানা ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে একটা বেতালা, সৃষ্টিছাড়া অর্কেস্ট্রার মতো শোনাচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে নিরেট পাটার মতো প্রকাণ্ড বুকটা উঠছে, নামছে।

একটা বালিশ আর চাদর নিয়ে মেঝেতে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল তনিমা।

চার

আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এক সপ্তাহ পর আবার এলেন সুবিমল রাহা। আজ তনিমার শুটিং নেই। তাকে বাইরে বেরুতে হবে না।

সেদিন সুবিমলের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের পার্টির দুই নেতা। কৃষ্ণকিশোর তরফদার আর পরিমল দত্ত। আজ কৃষ্ণকিশোররা আসেননি। সুবিমলের আজকের সঙ্গী দু'জন ঝকঝকে যুবক। তিরিশের কাছাকাছি বয়স।

অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং রুমে সবাইকে খাতির করে বসিয়ে দেবনাথ আর তনিমা ওঁদের মুখোমুখি বসেছে। সুবিমল আসবেন, এটাই ঠিক ছিল, কিন্তু সঙ্গে দু'টি অচেনা তরুণকে আনবেন, জানাননি। তনিমারা একটু ধন্দে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে কৌতূহলও হচ্ছিল।

তেমন একটা বেলা হয়নি। বাঁ দিকের মিউজিক্যাল ওয়াল-ক্লকটায় এখন ন'টা বেজে সতেরো। খোলা জানালাগুলো দিয়ে অজস্র মায়াবী রোদ এসে পড়েছে ভেতরে। অ্যাপার্টমেন্টটা আলোয় ভরে গেছে। এয়ার-কন্ডিশনার চালানো হয়নি। মাথার ওপর মসৃণ গতিতে ঘুরে চলেছে নতুন মডেলের একটা ফ্যান।

তনিমাদের ধন্দ কাটতে সময় লাগল না। কৌতূহলও মিটল। সুবিমল তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনির্বাণ মিত্র আর দীপেশ সেন। 'ইউনিক সারভিস' নাম যে ম্যানেজমেন্ট গ্রুপটাকে দিয়ে নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের পার্টি সমীক্ষা চালিয়েছিল, ওরা তার একজিকিউটিভ। প্রায় দু'মাস ঘুরে ঘুরে ওরাই জনমত বুঝবার চেষ্টা করেছে। ওদের সাহায্য করার জন্য অবশ্য আরও ছেলেমেয়ে ছিল। অনির্বাণদের ফাইনাল রিপোর্টের ভিত্তিতেই সুবিমলরা তনিমাকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে টিকেট দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-সব কথা আগের দিনই হয়ে গেছে। তনিমা বার বার বোঝাতে চেয়েছিল নির্বাচনে নামলে লোক হাসাবার মতো ব্যাপার হবে। নির্ঘাত তার জামানত জব্দ হয়ে যাবে। সমীক্ষা রিপোর্টের কথা জানিয়ে তার সব সংশয় এবং টেনশন কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন সুবিমল। ওঁদের পার্টির প্রার্থী হয়ে ইলেকশনে কনটেস্ট করার জন্য কথা দিয়েছে তনিমা। এখন আর ফেরার উপায় নেই। তবু মনের কোনও গোপন কুঠুরিতে হয়তো একটু খিঁচ থেকে গিয়েছিল। যারা সমীক্ষা চালিয়েছে তাদের কাছে পেয়ে সেটা যেন খোঁচাতে থাকে। সুবিমল রাহা সেন্টার টেবলের ওধারে বসে আছেন। ওঁর সামনে প্রসঙ্গটা টেনে আনা শোভন নয়। একই ব্যাপার লেবুর মতো

বার বার কচলালে তেতো হয়ে যায়। তবু সুবিমল যাতে অসন্তুষ্ট না হন, সেটা মাথায় রেখে হেসে হেসে তনিমা অনির্বাণদের বলে, 'একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে—'

অনির্বাণরা উৎসুক হল, 'কী কথা?'

সুবিমলকে দেখিয়ে তনিমা বলল, 'স্যার আগে একদিন আমাদের এখানে এসেছিলেন। সেদিনও বলেছেন, আজও বললেন, আপনাদের রিপোর্টটা আমার পক্ষে ফেভারেবল হয়েছে বলেই ওঁদের পার্টির টিকেট পেতে চলেছি।'

অনির্বাণ বলল, 'রাইট—'

'এবার কাইন্ডলি আমার দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?'

'গ্ল্যাডলি। বলুন কী প্রশ্ন—'

যুবক দু'টিকে দেখার পর থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে তনিমা। পুরুষমানুষ তাকে কাছে পেলে গিলে খেতে চায়, কিন্তু এদের সেই হামড়ে পড়া ভাব নেই। মাত্র চার ফিট দূরত্বে বাংলা ফিল্মের এক মহানায়িকা। কিন্তু অনির্বাণদের এতটুকু ছটফটানি নেই। খুবই শান্ত। সংযত। তনিমার ছবি টবি বা অভিনয় সম্পর্কে লেশমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। প্রয়োজনের বেশি একটা বাড়তি শব্দও তাদের মুখ থেকে বেরোয়নি। পাক্কা প্রোফেশনালরা যেমনটা হয় ঠিক তাই।

তনিমা বলল, 'স্যার বলেছিলেন, আমি যে কনস্টিটিউয়েন্সিতে কনটেস্ট করব তার এরিয়া বিরাট। পাঁচ লাখেরও বেশি ভোটার—'

অনির্বাণের কলিগ দীপেশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলে, 'ঠিকই বলেছেন।'

তনিমা বলল, 'শুনেছি আপনারা মাত্র আড়াই তিন হাজার ভোটারের সঙ্গে কথা বলেছেন। সামান্য ক'জনের মতামত জেনেই ধরে নিলেন, পাঁচ লাখের বেশির ভাগ লোকই আমাকে ভোট দেবে?'

'আমাদের সমীক্ষার পদ্ধতিটা কাউকে জানাই না। তবু আপনার যখন এত কৌতূহল তখন বলছি। এমন সব লোককে আমরা বেছে নিয়ে প্রশ্ন করি যারা ভাবনাচিন্তার দিক থেকে তাদের মতো আরও অনেকের প্রতিনিধি।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ধরুন, কোনও একটি রাস্তায় গিয়ে এক্স নামের একটা লোককে সিলেক্ট করলাম। প্রশ্ন করে করে জানা গেল, ওই অঞ্চলের কম-বেশি এক হাজার লোক তার মতো ভাবে। মানে সে যাকে ভোট দিতে চায়, ওই এক হাজারেরও তাকেই ভোট দেবার সম্ভাবনা। ধরা যাক, আড়াই তিন হাজারের ভেতর তিনশো জন

আপনাকে ভোট দিতে চায়। তা হলে থ্রি হানড্রেড ইনটু থাউজেন্ড হলে আপনি কতগুলো ভোট পাচ্ছেন, ভেবে দেখুন—'

তনিমা হাসতে লাগল, 'শুনতে বেশ ভালোই লাগছে, কিন্তু—'

'বলুন—'

'যা বললেন সেটা তো আপনার আন্দাজ—'

'ঠিকই বলেছেন—'

'আন্দাজটা কত পারসেন্ট মেলে?'

একটু থতিয়ে যায় দীপেশ। পরক্ষণে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলে, 'অলমোস্ট এইট্টি পারসেন্ট।'

তনিমা মজার গলায় বলল, 'তার মানে বাকি টোয়েন্টি পারসেন্টের ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে থাকছে।'

'মানে?'

'এইট্টি পারসেন্টের বদলে আমি যদি ওই টোয়েন্টি পারসেন্টের ভেতর পড়ে যাই?'

অনির্বাণ বলল, 'আপনি এত নৈরাশ্যবাদী কেন ম্যাডাম? প্লিজ একটু অপটিমিস্ট হোন—'

তরল গলায় তনিমা বলল, 'ঠিক আছে, তাই হওয়া যাক।'

সুবিমল রাহা সারা মুখে পাতলা হাসি ফুটিয়ে নীরবে বসে ছিলেন। বললেন, 'ম্যাডাম, যারা ডাইরেক্টলি সমীক্ষা চালিয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে যে সব বুঝে নিলেন সে জন্যে আমি ভেরি, ভেরি হ্যাপি।'

তনিমা উত্তর দিল না।

আপ্যায়নের দিকে দেবনাথের তীক্ষ্ণ নজর। সে এর মধ্যে কাজের লোকদের দিয়ে চা, কাজু বাদাম, সন্দেশ, কেক-টেক আনিয়েছে। তনিমা নিজের হাতে চা করে সবাইকে দিল।

কাপে আলতো চুমুক দিয়ে সুবিমল বললেন, 'ম্যাডাম, সেদিন আপনাকে বলে গিয়েছিলাম, ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের ছেলেদের একটা বিশেষ দরকারে নিয়ে আসব। মনে আছে?'

তনিমা বলল, 'আছে।'

'সেদিন আরও একটা কথা বলে গেছি, সেটা হল—'

সুবিমলকে শেষ করতে না দিয়ে তনিমা বলে ওঠে, ইলেকশনের ব্যাপারে কিছুদিন তাদের কাছে আমাকে ট্রেনিং নিতে হবে, এই তো?'

'রাইট।' তনিমার স্মৃতিশক্তি সুবিমলকে খুশি করে। বললেন, 'ট্রেনিংটা আজ থেকেই শুরু হচ্ছে। অনির্বাণ আর দীপেশকে সেই দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে।'

'সে কী!' তনিমা রীতিমতো অবাকই হল। 'ইলেকশন কমিশন এখনও নির্বাচনের তারিখ জানায়নি। এত তাড়াতাড়ি—'

তনিমাকে শেষ করতে দিলেন না সুবিমল। 'যতদূর খবর পেয়েছি, নেক্সট দু-তিন উইকের ভেতর জানিয়ে দেবে। তা যেদিনই জানাক, আমরা প্রিপারেশনটা আগে থেকেই শুরু করতে চাই। দীপেশরা রইল। আমার একটা জরুরি কাজ আছে। আজ উঠি। দেবনাথবাবুর কাছে আমার মোবাইল ফোনের নাম্বার আছে। দরকার হলে কনট্যাক্ট করবেন। আমিও যোগাযোগ রাখব।'

সুবিমল আর বসলেন না। দেবনাথ তাঁর সঙ্গে নিচে গিয়ে আগের দিনের মতো তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে মিনিট দশেকের ভেতর ফিরে এল।

এদিকে অনির্বাণ আর দীপেশ কাজ শুরু করে দিয়েছিল। বাংলা ফিল্মের এক সুপারস্টারকে কাছে পেয়ে বিগলিত হয়ে উচ্ছ্বাস উগরে দেবার মতো সময় তাদের নেই। ওদের কাছে প্রথমে কাজ। তারপর অন্য কিছু।

অনির্বাণ বলছিল, 'ম্যাডাম, আপনি যে পার্টির টিকেটে কনটেস্ট করতে চলেছেন তার হিস্ট্রিটা কি জানেন? আই মিন কীভাবে, কোন ইয়ারে এর প্রতিষ্ঠা, প্রথম সভাপতি কে ছিলেন, দেশের জন্যে এই পার্টি কী করেছে, পার্টির নেতাদের কী কনট্রিবিউশন, কতটা স্যাক্রিফাইস—এই সব সম্পর্কে কোনও ক্লিয়ার ধারণা আছে?'

নির্বাচনে নামার প্রস্তাবটা যখন আসে তখন রীতিমতো ধন্দে ছিল তনিমা। প্রচণ্ড নার্ভাসনেস অর্থাৎ স্নায়ুভীতি তার মস্তিষ্কে চেপে বসেছিল। পরে যখন সুবিমলরা ট্রেনিংয়ের কথা তুললেন, বেশ মজাই লেগেছে। এই মুহূর্তে অনির্বাণের প্রশ্নগুলো শুনতে শুনতে কৌতুক টৌতুক বাষ্প হয়ে উবে যায়। সে বলে, 'না। তেমন কিছু জানি না—'

দীপেশ তনিমাকে লক্ষ করছিল। তার সোফার পাশে একটা অ্যাটাচি কেস দাঁড় করানো রয়েছে। সেটা তুলে ভেতর থেকে দশ-বারো পাতার ঝকঝকে ছাপা একটা বুকলেট বার করে তনিমাকে দিতে দিতে নিস্পৃহ মুখে বলে, 'আমাদের সেই রকমই মনে হয়েছিল। তাই খুব সংক্ষেপে আপনার জন্যে এটা তৈরি করে নিয়ে এসেছি। কষ্ট করে ঘণ্টাখানেক পড়লেই পার্টির হিস্ট্রিটা জানতে পারবেন।'

কিছুক্ষণ হতবাক তাকিয়ে থাকে তনিমা। তারপর বিমূঢ়ের মতো বাংলা ভাষায় লেখা চটি বইটার পাতা ওলটাতে শুরু করে।

এবার অনির্বাণ জিজ্ঞেস করে, 'আপনার কনিস্টিটিউয়েন্সিতে আর ক'টা পার্টি কনটেস্ট করবে, জানেন?'

তনিমা আস্তে মাথা নাড়ে, 'ঠিক বলতে পারব না। মনে হয় তিন-চারটে।'

'নো ম্যাডাম। সবসুদ্ধ ছ'টা। তা ছাড়া কয়েকজন ইনডিপেনডেন্ট ক্যান্ডিডেটও থাকবে। ছ'টা পার্টির মধ্যে পাঁচটাকে নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। ইনডিপেনডেন্ট ক্যান্ডিডেটগুলো শুধু নাম্বার বাড়ায়। কেউ দু-তিন হাজারের বেশি ভোট পাবে না। কিন্তু আপনাকে ফাইট করতে হবে মাত্র একটা পার্টির সঙ্গে। ওরা রিয়েলি পাওয়ারফুল। ওদের অর্গানাইজেশন খুবই স্ট্রং। লাস্ট ইলেকশনে ওরা জিতেছিল।'

তনিমা উত্তর দেয় না। চুপচাপ শুনে যায়।

অনির্বাণ বলতে লাগল, 'ওদের পার্টি সম্বন্ধে কিছু জানা আছে?'

তনিমা মাথা ঝাঁকায়। তেমন কিছুই জানে না।

আগের মতোই অ্যাটাচি থেকে আরেকটা বুকলেট বার করে তনিমাকে দেয় দীপেশ, 'এটাও মন দিয়ে পড়বেন।'

তনিমার চোখমুখ থেকে মাত্রাছাড়া বিস্ময় উপচে পড়তে থাকে। সে বলে, 'রিয়ালি ইট ইজ স্ট্রেঞ্জ। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। এত সব পড়তে হবে কেন?'

দীপেশ বলে, 'ম্যাডাম, ইলেকশনের ডেট অ্যানাউন্স করার পর আপনাদের পার্টি ক্যান্ডিডেটদের লিস্ট জানিয়ে দেবে। তারপর কী হবে ভাবতে পারেন?'

'কী হবে?'

'পুরো মিডিয়া আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিশ্চয় জানেন, সাউথ ইন্ডিয়া কি ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ায় ফিল্মস্টাররা ইলেকশনে নামলে পিপল পাগল হয়ে যায়। ব্যাপারটা ওয়েস্ট বেঙ্গল এখনও পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। কোথাও একটা হেজিটেশন রয়েছে। হয়তো মনে করে ফিল্ম নিয়ে আছিস, তাই থাক না। হোয়াই দিস আন-ল'ফুল এন্ট্রি? কেন রাজনীতিতে তোমাদের এই অনুপ্রবেশ?'

তনিমা উত্তর দেয় না।

দীপেশ বলে, 'ফিল্ম থেকে রাজনীতি করতে আসছেন। মিডিয়ার লোকেরা একটু বাজিয়ে দেখবে না? তারা আপনার দিকে বেয়াড়া বেয়াড়া সব প্রশ্ন ছুড়ে দেবে। আপনাদের পার্টি, আপনাদের অপোনেন্ট—এ-সব সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে চাইবে। যাতে এমবারাসিং অবস্থায় না পড়েন সে জন্যে তৈরি থাকা ভালো। তা ছাড়া—'

তনিমা ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উৎকণ্ঠা বোধ করছিল। বলল, 'তা ছাড়া কী?'

দীপেশ জানায়, ভারত এখন নানা দিক থেকে বিপন্ন। তার সামনে অসংখ্য সংকট—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক। দেশ জুড়ে আরও কত যে সমস্যা! রয়েছে জঙ্গি তৎপরতা, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, ধর্মীয় মৌলবাদের মাথাচাড়া দেওয়া, পাশের রাষ্ট্র থেকে অনুপ্রবেশ, দেশের স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করার জন্য চক্রান্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেশ সম্পর্কে তনিমার ধারণা ভাসা ভাসা। দীপেশ যে সংকটগুলোর কথা বলল, তার মাথায় সে-সব তালগোল পাকিয়ে যায়। কাগজে রোজই এ নিয়ে রকমারি খবর বেরোয়। হেড লাইনেই সে শুধু চোখ বুলোয়। লম্বা রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পড়ার ধৈর্য বা সময় তার নেই। তনিমার পাঠ্য তালিকাটি এই রকম। রগরগে লাভ স্টোরি, ইংরেজি থ্রিলার আর যে ছবিতে সে কাজ করে তার চিত্রনাট্য। এর মধ্যে ভারতবর্ষ নেই। নেই লক্ষ সমস্যায় আকণ্ঠ ডুবে থাকা এই দেশ।

দীপেশ বলছিল, 'মনে রাখবেন, মিডিয়া বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখে সমানে ফায়ার করে যাবে। যা যা বললাম, সেগুলো সম্পর্কে কতটা কী জানেন, সমস্যাগুলোর সমাধান কীভাবে হওয়া সম্ভব—আপনার কাছে জানতে চাইবে।'

মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল তনিমার। বলল, 'মুশকিলে পড়ে গেলাম। আমি এ-সব নিয়ে কখনও কিছু ভাবিনি। তেমন কোনও ধারণাও নেই। মিডিয়াকে ফেস করতে হবে, ভাবতেই ভীষণ নার্ভাস ফিল করছি।'

দীপেশ একটা হাত তুলে অভয় দানের ভঙ্গিতে বলে, 'অত চিন্তা করছেন কেন? আমরা তো আছি।'

বিপুল দেশ, তার অসংখ্য সংকট। তনিমা যেন এক জটিল গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে। দীপেশ ভরসা দিয়েছে, তারা তার পাশে আছে। কিন্তু মিডিয়ার লোকেরা যখন তোপের পর তোপ দেগে যাবে তখন তো দীপেশরা সামাল দেবে না। উত্তর দিতে হবে তাকেই।

দীপেশ তনিমাকে লক্ষ করছিল। স্নায়ুভীতি যে তাকে ঠেসে ধরেছে, সেটা তার চোখমুখ দেখে আঁচ করা যাচ্ছে। একটু হেসে বলল, 'দেশের সমস্যাগুলো বোঝবার জন্যে আপনাদের মতো আনকোরা পলিটিসিয়ানদের মহাজ্ঞানী বা মহাবিশেষজ্ঞ হবার দরকার নেই। এই নিন—' অ্যাটাচি থেকে তিন নম্বর পুস্তিকাটি বার করে তনিমাকে দিল সে।

হতভম্বের মতো তনিমা জিজ্ঞেস করল, 'কী আছে এটায়?'

দীপেশ বলল, 'খুলে দেখুন না—'

দ্রুত পাতা ওলটাতে লাগল তনিমা। স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা মেড-ইজিতে যেমনটা থাকে, অনেকটা সেই রকম। দেশের সমস্যাগুলো নিয়ে

নানা প্রশ্ন, তার নিচে সংক্ষিপ্ত উত্তর। দু-একটা উত্তর পড়ে মনে হল, সংকটের গভীরে যাওয়া হয়নি, কৌশলে কথার মারপ্যাঁচে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এটাই তা হলে এখন রাজনীতির কায়দা?

তনিমার হাতে তিন-তিনটে বুক লেট। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা আরও বই দেবেন নাকি?'

'না। এগুলোই সাফিসিয়েন্ট।' দীপেশ বলতে লাগল, 'তিনটে বুকলেট মিলিয়ে সবসুদ্ধ ছত্রিশ পাতা। সামান্য ক্র্যাশ কোর্স। চারদিনের ভেতর মুখস্থ করে ফেলবেন। আজ সোমবার। ফিফথ ডে, মানে আসছে শনিবার ঠিক ন'টায় আমরা আবার আসব। বইগুলো থেকে প্রশ্ন করব। আপনি উত্তর দেবেন।'

'তার মানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মতো পড়া ধরবেন?'

দীপেশ জবাব দেয় না।

পাতলা বই তিনটে হাতেই ধরা আছে। তনিমা বলল, 'চার দিনে ছত্রিশ পাতা! যখন স্কুল করেছি তখনও এত পড়িনি।'

এবার অনির্বাণ বলে, 'ম্যাডাম, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে পার্লামেন্টে যেতে পারলে আপনার হাতে বিরাট রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে আসবে। তখন সারা দেশ জুড়ে আপনার কত খাতির, কত সম্মান। তার জন্য ক'টা পাতা পড়ে মুখস্থ করবেন। কাজটা কি খুবই কঠিন হল!'

জবাব না দিয়ে তাকিয়ে থাকে তনিমা।

অনির্বাণ এবার বলে, 'সিনেমার জন্যে পাতার পর পাতা ডায়ালগ মুখস্থ করেন না? এটাও ধরুন সেইরকম একটা ব্যাপার।'

তনিমা হতভম্ব। বলল, 'ফিল্ম আর ইলেকশন কি এক হল!'

'ম্যাডাম, ভেবে দেখুন নির্বাচনটাও সিনেমা কিনা। এখানেও সেই ক্যামেরা, সেই পাবলিসিটি, মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত সব ডায়ালোগ। স্টুডিওতে চার দেওয়ালের ভেতর কি আউটডোরে একটু একটু শুটিং করেন। আর এখন বিশাল কনস্টিটিউন্সিটাই আপনার স্টুডিও। আপনারা যা সিনেমা করেন, এটা তার থাউজেন্ড টাইমস বড় ব্যাপার। ইন্ডিয়ান ইলেকশন এখন গ্রেটেস্ট শো ইন দিস গ্লোব। কী, ঠিক বলছি?'

অনির্বাণ চমৎকার কথা বলতে পারে। মুগ্ধ হয়ে শোনার মতো। তনিমা হেসে ফেলল, 'মনে হচ্ছে ঠিকই বলছেন—'

একটু চুপচাপ।

তারপর অনির্বাণ বলল, 'প্রথম দিনের মতো ক্লাস শেষ হল। আজ তাহলে ওঠা যাক—'

তনিমা জিজ্ঞেস করল, 'যে বুকলেট তিনটে দিলেন, ওগুলো ঝাড়া মুখস্থ করার পর আর কিছু করতে হবে?'

'অনেক কিছু। এই তো সবে শুরু—'

অনির্বাণরা আর বসল না, ধীরে ধীরে উঠে পড়ল।

পাঁচ

মাঝখানের চারটে দিনই শুটিং ছিল তনিমার। একটা করে শিফট। সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা। চান খাওয়া ঘুম আর শুটিং বাদে দিনের বাকি সময়টা সেই চটি বই তিনটেতে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দিল সে। স্কুল-কলেজের পরীক্ষার আগেও এত পড়েনি।

চারদিন পর আবার এল অনির্বাণ এবং দীপেশ। আজ তনিমার শুটিং নেই। প্রথম দিনের মতোই দেবনাথকে নিয়ে সে লিভিং রুমে অপেক্ষা করছিল। হাতে সেই তিনটে পুস্তিকা।

মিনিট পাঁচেকের ভেতর চা খেয়ে কাজ আরম্ভ করে দিল অনির্বাণরা। আজেবাজে খোশ গল্প করে নষ্ট করার মতো সময় তাদের নেই।

অনির্বাণ কড়া মাস্টারমশাইদের মতো জিজ্ঞেস করল, 'সব মুখস্থ হয়েছে?'

চৌকশ অভিনেত্রী তনিমা। ছলাকলায় তুখোড়। হয়তো অনির্বাণদের নিয়ে একটু মজা করতে ইচ্ছে হল। হাতের বইগুলো বাড়িয়ে দিয়ে মুখটা করুণ করে বলল, 'দেখুন হয়েছে কিনা—'

পড়া ধরার ভঙ্গিতে প্রশ্নের করে প্রশ্ন করে যেতে লাগল অনির্বাণরা। পালা করে একবার অনির্বাণ, একবার দীপেশ। টাকাটক জবাব দিতে লাগল তনিমা।

প্রায় চল্লিশ মিনিট প্রশ্নোত্তরের পর দুই প্রোফেশনাল দারুণ খুশি। তনিমাকে হয়তো তারা নেহাতই গ্ল্যামারসর্বস্ব, চটকদার চিত্রতারকা ভেবেছিল—যার বাইরের দিকটায় ঝকমকানি, ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাদের ছাত্রীটি খুবই মেধাবী, তার স্মৃতিশক্তি প্রখর।

তনিমা জিজ্ঞেস করল, 'পেরেছি?'

প্রোফেশনালদের নিস্পৃহ থাকতে হয়। কিন্তু অনির্বাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'কী বলছেন! প্রত্যেকটা প্রশ্নের অ্যানসার ক্যারেক্ট। এতটা আমরা আশা করিনি—'

দীপেশ বলল, 'একেবারে ফ্লাইং কালারসে বেরিয়ে এসেছেন। উই আর ভেরি ভেরি হ্যাপি—'

তনিমা হাসতে থাকে, 'যাক বাবা, পরীক্ষায় পাস করে গেছি। কী ভয় যে করছিল!'

দেবনাথ এতক্ষণ দমবন্ধ করে বসে ছিল। শব্দ করে বুকের ভেতরকার আটকানো বাতাস বার করে দিয়ে, দুই হাত মুঠো করে মাথার ওপর তুলে ভীষণ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলতে থাকে, 'জানেন, তনিমা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে—'

ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টটা বাড়াবাড়ি। তনিমা হাত তুলে দেবনাথকে থামিয়ে দেয়। উচ্ছ্বাস চাড়া দিলে সে যতটা, তার দশ গুণ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লোকটা তাকে আকাশে চড়িয়ে দেবে। তনিমা এই, তনিমা সেই, ইত্যাদি—

দীপেশ বলল, 'ম্যাডাম, এবার নতুন ক্লাস শুরু করা যাক—'

তনিমা বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

তার ব্যাগ থেকে একটা ম্যাপ বার করে টেবলের ওপর রাখল দীপেশ। উৎসুক সুরে তনিমা জিজ্ঞেস করে, 'এটা দিয়ে কী হবে?'

দীপেশ বুঝিয়ে দিল, 'এটা ভীষণ ইমপর্টান্ট ব্যাপার। আপনি যে কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে কনটেস্ট করবেন এটা হল সেখানকার মানচিত্র। ওই এলাকার প্রতিটি বড় রাস্তা, প্রতিটি অলিগলির ড্রইং এতে রয়েছে।'

একজন থামে তো, সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন তার খেই ধরে। এবার অনির্বাণ বলে, 'জায়গাটা কসমোপলিটান। বাঙালি বিহারি মাড়োয়ারি গুজরাটি, এমনি নানা প্রভিন্সের লোক রয়েছে। কতকগুলো লাল নীল কালো সবুজ সার্কল দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। এগুলো কী ইন্ডিকেট করছে?'

'বাঙালিদের সংখ্যা যেখানে বেশি সেখানে রয়েছে সবুজ সার্কল। নীল সার্কল হল মাড়োয়ারি প্রধান এলাকা। কালো আর লালে বিহারি আর গুজরাটিরা বেশি। তা ছাড়া আরও দু'টো কালারও রয়েছে—'

'হ্যাঁ। ব্রাউন আর লাইট গ্রিন। এগুলো কী জন্যে?'

'ব্রাউন সার্কলগুলো হল বস্তি। আর লাইট গ্রিন হল রেড-লাইট এরিয়া—'

তনিমা অবাক হচ্ছিল। 'এই ম্যাপ দিয়ে আমি কী করব?'

অনির্বাণ জানায়, নানা রঙের বৃত্ত এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কোথায় কী ধরনের ভোটাররা রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে আগে থেকেই তনিমার স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া দরকার। কেননা নির্বাচনী প্রাচারে গিয়ে সব এলাকায় একরকম বক্তৃতা দিলে চলবে না। এক-এক জায়গায় এক-এক রকম।

একটু আগে লঘু মেজাজে ছিল তনিমা। এখন তাকে সামান্য চিন্তিত দেখায়। জানতে চায়, কোথায় কী বলতে হবে।

অনির্বাণ বলল, 'সাত সেট বক্তৃতা আমরা তৈরি করে এনেছি। ওগুলো যে ঝাড়া মুখস্থ করে তোতাপাখিব মতো আউড়ে যেতে হয়ে তা নয়। য়ু আর হাইলি ইনটেলিজেন্ট অ্যান্ড এডুকেটেড লেডি। বক্তৃতাগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিলেই ধরতে পারবেন কোন এরিযার ভোটার কী বললে খুশি হবে। যখন ক্যামপেনে বেরুবেন, আমরা বক্তৃতায় যে মডেল তৈরি করে দিয়েছি, সে-সব নিজের ভাষায় বলবেন। মুখস্থ বুলি নয়, মনে হবে স্পনটেনিয়াসলি আপনার মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসছে।' ব্যাগ থেকে একটা খাম বার করে বলল, 'এর ভেতর বক্তৃতাগুলো আছে।'

খাম নিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে তনিমা। বিষয়টা এতক্ষণে তার বোধগম্য হয়েছে।

অনির্বাণের পর ফের দীপেশ। সে বলল, 'অন্য সব জায়গার মতো ওখানেও কমন কতকগুলো সমস্যা রয়েছে। পানীয় জল ঠিকমতো পাওয়া যায় না। রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা। বেকারের সীমা-সংখ্যা নেই। হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা ভীষণ খারাপ। হাজারটা অভিযোগ। আপনাকে পেলে মানুষ চারদিকে থেকে ছেঁকে ধরবে। তখন আপনাকে কী করতে হবে?'

তনিমার গলায় প্রতিধ্বনি শোনা গেল, 'কী করতে হবে?'

'মোটেও নার্ভাস হবেন না। আপনি দেশের এত বড় একজন মহানায়িকা। মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন। মুখে হাসিটি লেগে থাকবে। যাবতীয় সমস্যার দায় অগেকার এম. পি এবং তাদের গভর্নমেন্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলবেন, 'আমি তো নতুন। একদিনে সমস্ত প্রবলেমের সলিউশন করার মতো ম্যাজিক আমার হাতে নেই। সেই ফার্স্ট জেনারেল ইলেকশনের সময় থেকে পঞ্চাশ বাহান্ন বছরে ধরে শুধু প্রতিশ্রুতি শুনে আসছেন। আমি আপনাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখাব না। সাধ্যমতো চেষ্টা করব কিছু করার। দয়া করে আপনারা আমাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন।'— কি, কথাগুলো মনে থাকবে?'

বিভোর হয়ে শুনছিল তনিমা। বলল, 'নিশ্চয়ই মনে থাকবে। একটা কথা ভাবছিলাম—'

'কী?'

'ইলেকশনের ব্যাপারটা আপনারা এত ভালো বোঝেন। নিজেরাই নির্বাচনে কনটেস্ট করলে তো পারতেন।'

'বোঝা আর কনটেস্ট করা এক নয়। আমরা আউট অ্যান্ড আউট প্রোফেশনাল। ফিজ নিয়ে ক্লায়েন্টের জন্যে প্ল্যান করে দিই। তাই বলে নিজেরা এম. পি কি মন্ত্রী টন্ত্রী হব, ভাবতেই পারি না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর দীপেশ বলল, 'নেক্সট কবে এলে আপনার অসুবিধে হবে না?'

দেবনাথ তনিমার শুটিংয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটি খবর রাখে। কেননা সে-ই ফিল্মওলাদের তনিমার ডেট ভাগ করে দেয়। কবে, কোন শিফটে, কোন প্রডিউসাবের ছবিতে তার শুটিং, সব দেবনাথের মুখস্থ। সে বলল, 'পরশু বিকেলের শিফটে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তনিমার শুটিং আছে। সকালের দিকে আপনারা আসতে পারেন।'

দীপেশ তনিমাকে জিজ্ঞেস করে, 'মাঝখানে একটা দিন। এর ভেতর বক্তৃতাব যে সেটটা দিলাম, পড়ে নিতে পারবেন?'

মাথা সামান্য হেলিয়ে দেয় তনিমা, 'আশা করি, পারব।'

ছয়

একদিন বাদ দিয়ে ফের এল দীপেশরা। যে বক্তৃতার সেটটা তনিমাকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো কতখানি সড়গড় হয়েছে, আজ তার টেস্ট নেওয়া হবে।

'কেমন আছেন?' 'ভালো আছি'—এই জাতীয় সাধারণ ভদ্রতাসূচক কথাবার্তার পর তনিমা মজার গলায় বলল, 'আপনাদের সেই ভাষণগুলো মেমোরিতে ঢুকিয়ে নিয়েছি। আমি রেডি। পড়া ধরুন—' বলে বক্তৃতার সেটটা দীপেশের দিকে বাড়িয়ে দিল।

দীপেশ সেগুলো না খুলেই বলল, 'বাঙালিদের পাড়ায় গিয়ে কী বলবেন, বলুন—'

তনিমার মনে পড়ে গেল, বক্তৃতার মডেলটা দীপেশরা করে দিয়েছে। বলেও দিয়েছিল ওটা হুবহু উগরে দেবার দরকার নেই। মূল কাঠামোটা ঠিক রেখে নিজের ভাষায় বলতে হবে।

তনিমা নামতা পড়ার মতো গড় গড় করে বলতে লাগল।

অনির্বাণ হাত নাড়তে নাড়তে ভীষণ ব্যস্তভাবে বল ওঠে, 'উঁহু—উঁহু। নট ইন দ্যাট মানার। বসে না, ওই কোণে গিয়ে দাঁড়ান—' একটু দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল সে। তনিমা উঠে সেখানে চলে যায়।

অনির্বাণ বলে, 'আপনি এত বড় আর্টিস্ট। তড়বড় না করে, হাসি মুখে, স্লোলি, ইমোশন মিশিয়ে বলে যান—'

তনিমা একটু চুপ করে থেকে মনে মনে মহলা দিয়ে শুরু করে। অনির্বাণরা কী চাইছে সেটা ধরে ফেলেছে সে।

কখনও গলার স্বর খাদে নামিয়ে, কখনও আবেগ ঢেলে পুরোটা বলে যায় তনিমা। বছরের পর বছর বাংলা ফিল্মের ইমোশনাল সিনগুলোতে যার অভিনয় দর্শকদের বুক ভারী করে তুলেছে, কিংবা সেন্টিমেন্টের ঢল নামিয়ে লহমায় যে চোখের জল বার করে আনতে পারে তার পক্ষে এই মুহূর্তে সে যা বলল বা যে অভিনয়টুকু করল তা তো নেহাতই জলভাত। তনিমা পেশাদার অভিনেত্রী। ইমোশন, সেন্টিমেন্ট, মাতিয়ে দেওয়া প্রেমের দৃশ্য—যা চাই, তার কাছে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যাবে। যেমন চাহিদা, সঙ্গে সঙ্গে তেমনটি সাপ্লাই।

অনির্বাণরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এতটা তারা ভাবতেই পারেনি। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি পাওয়া গেছে। এমনিতে ওরা কোনও কারণেই গলে পড়ে না। উচ্ছ্বাস টুচ্ছ্বাস খুব কম। কিন্তু এখন হইচই বাধিয়ে দিল।

দীপেশ বলল, 'মার্ভেলাস। কেন আপনি সুপারস্টার, আপনার আর্টিস্টিক স্কিল যে কোন লেভেলের, এবার সেটা বুঝতে পারছি।'

অনির্বাণ বলে, 'কোনও পলিটিক্যাল লিডারের পক্ষে এভাবে বক্তৃতা দেওয়া সিম্পলি ইমপসিবল। ইলেকশনের প্রচারে বেরিয়ে এভাবে যদি বলতে পারেন, রেজাল্ট সম্পর্কে ভাবতে হবে না।' একটু থেমে বলল, 'ইমোশন বলুন, সেন্টিমেন্ট বলুন, মানুষের এই নরম জায়গাগুলো টাচ করতে পারলে তার মার নেই। লিটারেচারে, ফিল্মে, পলিটিকসে এ-সব নিয়ে যে যত ভালো খেলতে পারবে তার তত সাকসেস। এর সঙ্গে যদি একটু ড্রামা মেশানো যায়, তা হলে তো কিস্তিমাত।'

দুই প্রোফেশনাল প্রশংসার ঢল বইয়ে দিয়েছে। গুণকীর্তন বেশ ভালোই লাগল তনিমার। সে বলল, 'বাকি বক্তৃতাগুলো এবার সেরে ফেলি?'

দীপেশ বলল, ' খুব একটা দরকার নেই। ব্যাপারটা আপনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। তবু যখন ইচ্ছে হয়েছে একবার করে বলুন—'

তনিমা আঁচ করে নিল, তার দক্ষতা সম্পর্কে অনির্বাণদের লেশমাত্র সংশয় নেই। তবে ঝানু প্রোফশনালদের ক্ষেত্রে যা হয়, এতটুকু খুঁত তারা রাখতে চায় না। তনিমা আগের মতোই কণ্ঠস্বর উঠিয়ে, নামিয়ে, ঢেউ খেলিয়ে বাকি ভাষণগুলো পরপর শেষ করল।

একনাগাড়ে বকে গেছে তনিমা। শেষের দু'টো বক্তৃতায় একটু গোলমাল হল। সেটা শুধরে দিয়ে দীপেশ বলল, 'এমনিতে সব ঠিক আছে। তবে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে যখন বক্তৃতা দেবেন, ইমোশন ছাড়াও আরেক দিকে নজর রাখতে হবে।'

'কী সেটা?'

'হিউমার। মজা। ফান। তবে সবসময় নয়, কখনও সখনও। পিপলের মুড বুঝে। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন?'

'কী?'

'অনবরত ইমোশনাল বক্তৃতা দিলে একঘেয়ে হয়ে পড়বে। মানুষ মজাও চায়। অবশ্য—'

উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে তনিমা।

দীপেশ বলতে লাগল, 'সব কিছু আমাদের পক্ষে অ্যান্টিসিপেট করে লিখে দেওয়া সম্ভব নয়। এক-এক জায়গার মানুষ এক-এক ধরনের মজা এনজয় করে। আমরা কিছু কিছু নমুনা আপনাকে দেব। সেগুলো হয়তো কাজে লাগল না। আপনার শ্রোতাদের মেজাজ আন্দাজ করে নিয়ে ফানগুলো তক্ষুনি তৈরি করে নেবেন। এখন থেকে নানারকম হিউমার ভাবতে থাকুন—'

অনির্বাণ বলল, 'কোথাও দেখবেন একেবারে গোদা লোকজন, মানে অর্ডিনারি 'মাস' বলতে যা বোঝায়— আপনার ভাষণ শুনতে এসেছে। আবার কোথাও মোটামুটি লেখাপড়া জানা শ্রোতা পাবেন। কোথাও এডুকেটেড, ইনটেলিজেন্ট মানুষজনকে ফেস করতে হবে। এদের এক-এক টাইপের রুচি। তাদের জন্যে আলাদা আলাদ ফানের কথা মাথায় রাখতে হবে।'

লিভিং রুমের কোণ থেকে ফিরে এসে সোফায় বসে পড়েছিল তনিমা। আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে বলল, 'ওরে বাবা, আমি কি এসব পারব?'

'আপনি একজন ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট। খুব পারবেন।'

নির্বাচন কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতার ব্যাপারে তালিম দেবার পর দীপেশরা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

অনির্বাণ বলল, 'এবার আপনার ড্রেস সম্পর্কে শুনুন—'

বুঝতে না পেরে তনিমা বলে, 'ড্রেস সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা ঝাঁকায় অনির্বাণ। তনিমার পরনে জিনস আর শার্ট। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'এই পোশাকে ইলেকশন ক্যামপেনে যাওয়া যাবে না।'

তনিমা উত্তর দেয় না।

অনির্বাণ ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিল। ভারতবর্ষ ইউরোপ বা আমেরিকা হয়ে যায়নি। এখানকার সোসাইটি আদ্যোপান্ত রক্ষণশীল। মেয়েদের সতী সাবিত্রী ইমেজটাই সবার পছন্দ। কথায়বার্তায় আচরণে পোশাকে মেয়েরা হবে পবিত্র গৃহলক্ষ্মীমার্কা। নম্র, শোভন, শান্ত। শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষই চায় না, মেয়েরা সিগারেট বা হুইস্কি খাক, জিনস বা প্যান্ট পরুক। উগ্র সাজসজ্জা এ-দেশের মানুষের দু'চোখের বিষ।'

এক মনে শুনে যাচ্ছিল তনিমা। তার বেশ মজাই লাগছে। ক্বচিৎ কখনও সে শাড়ি পরে। তার প্রিয় পোশাক জিনস, টপ, স্পোর্টস গেঞ্জি, লম্বা ঝুলের স্কার্ট, মাঝে মধ্যে সালোয়ার কামিজ। বিয়ে বাড়ি টাড়ি গেলে বেনারসি বা মাইশোর সিল্ক। ফিল্মে অবশ্য শাড়ি টাড়ি পরতে হয়।

তনিমা জিজ্ঞেস করল, 'ইলেকশন ক্যামপেনে নিশ্চয়ই শাড়ি পরে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ। শাড়ি হল ভারতীয় নারীত্বের সেরা বিজ্ঞাপন। তাদের ন্যাশনাল আইডেনটিটি।'

অনির্বাণ নির্বাচনি পোশাক সম্বন্ধে সবিস্তার ব্যাখ্যা করে। হাতকাটা খাটো পিঠ-দেখানো ব্লাউজ নয়। কনুই অব্দি হাতা, পিঠের দিকে ফাঁক থাকবে না— এই ধরনের ব্লাউজ পরতে হবে। শাড়ি তেমন কিছু দামি নয়, চোখধাঁধানো রং-ও নয়। লাইট কালারের টাঙ্গাইল হলে ভালো হয়। কোমরের বাঁধন নাভির নিচে হলে চলবে না। পায়ে সাধারণ স্লিপার।

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করে, 'যে-ধরনের ব্লাউজের কথা বললাম, সেরকম কি আপনার আছে?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ে তনিমা।

'একজন টেলরকে পাঠাব। সে আপনার মাপ নিয়ে যাবে। এই উইকে কবে, কোন সময় পাঠালে আপনার অসুবিধে হবে না?'

তনিমা নয়, এবার উত্তরটা দিল দেবনাথ। এই সপ্তাহে তনিমার বাকি যে-সব শুটিং রয়েছে সেগুলো সবই মর্নিং শিফটে। যে কোনও দিন বিকেলের দিকে, পাঁচটা নাগাদ দরজি আসতে পারে।

অনির্বাণ তনিমাকে বলল, 'ড্রেসের ব্যাপারটা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। যদি কিছু চেঞ্জ করতে হয়, পরে ভাবা যাবে। এখন মেক-আপ—'

'মেক-আপ মানে?'

'মুখে চড়া পেইন্ট করে, গায়ে বিদেশি সেন্ট ঢেলে নির্বাচনি প্রচারে বেরুবেন, সেটা কিন্তু মোটেও চলবে না। ক্যামপেনে নামবার আগে আমাদের মেক-আপম্যান এসে আপনাকে সাজিয়ে দিয়ে যাবে।'

প্রথম দিকে তনিমার যতটা বিস্ময় ছিল, এখন আর তেমনটা নেই। সে বলে, 'বুঝেছি। আপনারা আমার একটা ঘরোয়া ইমেজ দিতে চান, তাই তো?'

গলার স্বর উঁচুতে তুলে অনির্বাণ বলে, 'এক্‌জাক্টলি। আপনার কনস্টিটিউয়েন্সির প্রতিটি ভোটার যেন মনে করে, আপনি তাদের পাশের বাড়ির মেয়ে।'

দীপেশ হালকা সুরে জুড়ে দিল, 'দূর আকাশের নক্ষত্র নন।'

তনিমা বলল, 'ঠিক আছে, রাজনীতিতে একবার যখন নাম লিখিয়েই ফেলেছি, পাশের বাড়ির মেয়ের ইমেজ নিয়েই ভোট চাইতে বেরুব। বক্তৃতা হল, ড্রেস হল, মেক-আপ হল। আর কী বাকি রইল?'

'আপাতত অন্য কিছু নেই। ইলেকশনের তারিখ জানানোর পর আপনাদের পার্টি ক্যান্ডিডেটদের লিস্ট বার করুক। তারপর বাকি কাজ। সে-সব ইলেকশনের রেজাল্ট না বেরুনো পর্যন্ত চলবে।'

অনির্বাণরা আর বসল না। আজকের মতো তালিম শেষ হয়েছে। ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সাত

ইলেকশন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে দিয়েছে। সারা ভারতের অন্য সব রাজ্যের মতো পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক মহলেও তুমুল ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। প্রতিটি পার্টি একে একে তাদের প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করছে। তবে তনিমা যে দলটির ক্যান্ডিডেট তারা এখনও কিছু জানায়নি। তাদের চূড়ান্ত তালিকাটি তৈরি হতে আরও কয়েকদিন লাগবে।

তনিমাদের পার্টি একটা সর্বভারতীয় দল। তাদের সদর দপ্তর দিল্লিতে। পশ্চিমবঙ্গের মূল কার্যালয় উত্তর কলকাতায়। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে। তনিমা কখনও সেখানে যায়নি। তবে দেবনাথের প্রচণ্ড উৎসাহ। ইদানীং প্রায় রোজই কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে হানা দিচ্ছে। ফিরে এসে হাত-পা ঝাঁকিয়ে, প্রবল উত্তেজনার সুরে সেখানকার যে-সব বিবরণ দিচ্ছে তা চমকে যাবার মতো। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই সব অঞ্চলের স্থানীয় নেতারা এসে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। কত যে ধরাধরি, কত যে কাকুতিমিনতি ! নেহাত চক্ষুলজ্জায় বাধে, নইলে সুবিমল রাহার পা জাপটে ধরত। লোকচক্ষুর আড়ালে ধরছে কি না, কে জানে।

তনিমা অবাক। জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

'সুবিমলবাবু পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রেসিডেন্ট। ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। এখানে তাঁর কথাই শেষ কথা। উনি দিল্লির মেইন দপ্তরে যে ক্যান্ডিডেটদের নাম পাঠাবেন, সঙ্গে সঙ্গে তা অ্যাপ্রুভড হয়ে যাবে। তাই—'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

দেবনাথ সবিস্তার জানালো, পার্টির শাখাগুলোকে নির্বাচনী প্রার্থীদের নাম, যোগ্যতা ইত্যাদি জানিয়ে তালিকা করে দিল্লির প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতে হয়।

দলের সর্বভারতীয় কার্যকরী সমিতি সেটা খতিয়ে দেখে অনুমোদন করলে তবেই নির্বাচনে লড়ার টিকেট পাওয়া যায়। সুবিমল রাহার মতো সৎ, কুশলী, দাপুটে নেতা কারও নাম সুপারিশ করলে দিল্লি কোনও রকম আপত্তি করবে না, চোখ বুজে মেনে নেবে।

দেবনাথ বলে, 'তোমাকে আগে কতবার জানিয়েছি, এম. পি হওয়া মানে এল ডোরাডোয় পৌঁছে যাওয়া। সামনে শুধু সোনার খনি। টিকেটের জন্য ঝাঁপাবে না?' একটু থেমে বলে, 'অবশ্য—'

তনিমা জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'দু-চারটে আদর্শবাদী গবেটও রয়েছে। তারা দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে কিছু করতে চায়।'

' সেটা কি খুব খারাপ কাজ?'

দেবনাথ একটু থতিয়ে যায়। তারপর বলে, 'আরে বাবা, ওয়ার্ল্ডটা কি আগের জায়গায় আছে?'

বুঝতে না পেরে তনিমা বলে, 'মানে?'

'স্বাধীনতার আগে আইডিয়ালিজম টিজমের কিছু ভ্যালু ছিল। তখন তো আর এম.এল.এ, এম.পি বা মন্ত্রী ফন্ত্রী হয়ে আখের গুছিয়ে নেবার বন্দোবস্ত ছিল না। তখন শুধু স্যাক্রিফাইস আর স্যাক্রিফাইস। জেল খাটো, পুলিশের মার খাও, নইলে ফাঁসির দড়িতে ঝোলো। এখন ইলেকশনে তরে যেতে পারলে তোমার হাতে পাওয়ার আসবে, তোমার চারপাশে কোটি কোটি টাকার পাত্তি উড়বে। আদর্শবাদকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে খালি কামিয়ে নাও। ছুনুমুনু, জমানা বদল গিয়া। তাই পলিটিসিয়ানরা পার্টির টিকেটের জন্যে উন্মাদ হয়ে গেছে।'

তনিমা উত্তর দিল না। সে শুধু তাকিয়ে থাকে।

নির্বাচনেব তারিখ ঘোষণার দিনকয়েক বাদে সুবিমল রাহা আর কৃষ্ণকিশোর তরফদার এসে হাজির। ওঁরা এলেন সন্ধের দিকে। আগে থেকে সময় ঠিক করেই এসেছেন।

চা খেতে খেতে সুবিমল বললেন, 'পরশু আমাদের ক্যান্ডিডেটদের লিস্ট প্রকাশ করা হবে। এ-ব্যাপারে আপনাকে কিছু জানানো দরকার।'

তনিমা উৎসুক চোখে তাকায়।

সুবিমল বলতে লাগলেন, 'লিস্টটা বার করার পর থেকে যতদিন না ভোট শেষ হচ্ছে, আপনার কোনও ছবি রিলিজ করা, বা পুরনো ছবি দেখানো চলবে না।'

তনিমার এই ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা আছে। যে-সব চিত্রতারকা এর আগে নির্বাচনে নেমেছে তাদের ছবি সম্বন্ধে এ-জাতীয় নিষেধাজ্ঞার খবর সে কাগজে পড়েছে। বলল, 'জানি। কিন্তু—'

'কী?'

'কেউ যদি ছবি রিলিজ করে দেয়, বা হল-এ আর টিভি'তে পুরনো ছবি দেখায়, আমি আটকাবো কী করে?'

'ও নিয়ে ভাববেন না। আমরা তার ব্যবস্থা করব।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় তনিমা বলে, 'অনেক প্রডিউসারকে আমার শুটিং ডেট দেওয়া আছে। সেগুলো ক্যানসেল করলে ওঁরা ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন। বহু টাকা ক্ষতি হবে। একজন প্রোফেশনাল অ্যাকট্রেস হিসেবে সেটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এমনটা করলে কেউ আমাকে ডাকবে না। আমার কেরিয়ারের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'শুটিং আপনি করতে পারেন। কোনও রেস্ট্রিকশন নেই। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার কনস্টিটিউয়েন্সিটা বিরাট। আমরা ঠিক করেছি, নেক্সট উইক থেকে আপনাকে নিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করব। অত বড় এলাকায় ঘুরে ঘুরে ক্যামপেন চালানো কি মুখের কথা! মিনিমাম দু'মাস লেগে যাবে। নাওয়া-খাওয়ার সময় পাবেন না। শুটিং করবেন কী করে?'

'খুব মুশকিল হল।'

সুবিমল রাহা চুপচাপ শুনছিলেন। এবার তিনি সমস্যাটার মোটামুটি সুরাহা করে দিলেন। শুটিংয়ের ডেটগুলোতে শিফট বুঝে পদযাত্রা, জনসংযোগ, মিটিং ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হবে। সকালে শুটিং থাকলে বিকেলে পদযাত্রা-টাত্রা। বিকেলে থাকলে প্রচারটা সকালে।

সুবিমল বললেন, 'এতে অবশ্য আপনার পরিশ্রমটা খুব বেশি হয়ে যাবে।'

তনিমা হাসল, 'ওটা খুব বড় ব্যাপার নয়। আমাদের তো কোনও কোনও দিন দু'শিফটেও কাজ করতে হয়। সকালে বেরুলাম, ফিরতে ফিরতে রাত। ধরা যাক, আমার কনস্টিটিউন্সিতে না হয় একটা এক্সট্রা শিফট খাটলাম।'

সুবিমল খুশি হলেন, 'ক্যান্ডিডেটের এইরকম উদ্যম থাকা দরকার। কিন্তু—'

সুবিমলের কোথায় আটকাচ্ছে, ধরতে না পেরে তনিমা তাকিয়ে থাকে।

সুবিমল বললেন, 'ক্যামপেনের শেষের একটা মাস কিন্তু ভীষণ টাফ।'

'কীরকম?'

'সেই সময়টা নির্বাচন কেন্দ্রের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। ভোরে বেরিয়ে কখন বাড়ি ফিরবেন, ঠিক নেই। ওটাই হচ্ছে ফাইনাল মোমেন্ট। যে-ক্যান্ডিডেট যত বেশি ভোটারকে নিজের মুখ দেখাতে পারবে সে তত গেইন করবে। শেষ অব্দি লেগে থাকলে ভোটের মেশিনে বাটন টেপার সময় আপনার মুখটাই লোকের মনে পড়বে। তাই—'

তনিমা কোনও প্রশ্ন করল না। সুবিমল একটানা যা বলে গেলেন সে তার সারমর্ম বুঝতে পেরেছে। তিনি আরও কী বলতে চাইছেন, সে জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

সুবিমল থামেননি, 'ক্যামপেনের শেষ দিকটা আপনার পক্ষে শুটিং করা সম্ভব হবে না। ওই সময়ের ডেটগুলো ক্যানসেল করে ইলেকশনের পর প্রডিউসারদের ফ্রেশ ডেট দেবেন। আশা করি, ওঁরা এটুকু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন।'

তনিমা বলল, 'আমি এই নিয়ে প্রডিউসারদের সঙ্গে কথা বলব।'

সুবিমল বললেন, 'তাঁদেরই একজন আর্টিস্ট পার্লামেন্টে যাবেন, এটা হোল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে গৌরবের কথা। আশা করি, খুশি মনেই প্রডিউসাররা আপনার ডেট অ্যাডজাস্ট করবেন।'

একটু নীরবতা।

তারপর সুবিমল বললেন, 'কাল কি আপনার শুটিং আছে?'

'না। কেন বলুন তো?'

'তাহলে কাল দুপুরে আমাদের পার্টি অফিসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'সেখানে কোনও দরকার আছে?'

'আছে।'

সুবিমল বুঝিয়ে বললেন, তিনি, কৃষ্ণকিশোর এবং পরিমল ছাড়া পার্টির অন্য কোনও নেতা বা কর্মীর সঙ্গে তনিমার আলাপ হয়নি। সবাই অবশ্য তার নাম জানে, সিনেমা-হলে বা টিভিতে তার অজস্র ছবি দেখেছে। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো ওরাও তনিমার ফ্যান। গুণমুগ্ধ ভক্ত। এরা তার সঙ্গে পরিচয় করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

সুবিমল বলতে লাগলেন, 'তা ছাড়া, এখন থেকে আপনি আমাদের একজন। যে-পলিটিক্যাল পার্টির টিকেটে ইলেকশনে কনটেস্ট করছেন সেখানকার পরিবেশ কেমন, সহকর্মীরা কী ধরনের—এ-সব সম্পর্কে আপনারও পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা দরকার।' একটু থেমে ফের শুরু করলেন, 'পার্টির ছেলেরা আপনার জন্যে ইলেকশনের প্রচারে খাটবে। ওদের সঙ্গে যদি দু-একটা কথা বলেন, ছেলেগুলো জান দিয়ে দেবে।'

সুবিমল যা বললেন তা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। দেবনাথের জোরাজুরি এবং সুবিমলদের অনুরোধে তনিমা নির্বাচনে নামতে রাজি হয়েছে। কে বলতে পারে, হুট করে যদি সে জিতে যায়, হয়ত সিনেমার পাট চুকিয়ে রাজনীতি নিয়েই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হবে। কলকাতার না হলেও মুম্বই এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক চিত্রতারকা এখন এম. পি বা মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছে। এদের মতো শেষ পর্যন্ত যদি রাজনীতিই তার কেরিয়ার হয়ে দাঁড়ায়, যে পলিটিক্যাল পার্টি ওপরে ওঠার সিঁড়ি পায়ের কাছে এগিয়ে দিয়েছে তার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত জেনে নেওয়া উচিত। সুবিমল কৃষ্ণকিশোর এবং পরিমলকেই সে শুধু দেখেছে। অন্য সব নেতা এবং মেম্বারদের যত জনের সঙ্গে সম্ভব, আলাপ-পরিচয় করা খুবই জুররি। এদের সাহায্য ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়। কাম্য বস্তুটা অধরা থেকে যাবে।

তনিমা বলল, 'ঠিক আছে, যাব।'

সুবিমল বললেন, 'কৃষ্ণকিশোর এসে আপনাকে আর দেবনাথবাবুকে নিয়ে যাবে।'

আট

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে থামওলা বিরাট চারতলা একটা বাড়ির পুরোটা জুড়ে সুবিমলদের পার্টি অফিস। বোঝাই যায়, বিল্ডিংটা ব্রিটিশ আমলের তৈরি। মূল বাড়ির চারপাশে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। তারপর কমপাউন্ড ওয়াল। রাস্তার দিকে উঁচু গেট। গেটের মাথায় পার্টির সাইনবোর্ড।

কাঁটায় কাঁটায় দু'টোয় তনিমাদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন কৃষ্ণকিশোর। গেট পেরিয়ে কমপাউন্ডে ঢুকে টাটা সুমো থামতেই হইচই শুরু হয়ে গেল।

তনিমার দিকের জানালাটা আধখোলা ছিল। তার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়াতেই সে হকচকিয়ে গেল। পার্টি অফিসের কমপাউন্ডে নানা বয়সের লোকজনে ঠাসা। এমন থিকথিকে ভিড় যে ছুঁচ ফেলার জায়গা নেই। এরাই তুমুল শোরগোল বাধিয়ে চতুর্দিক সরগরম করে তুলেছে।

কৃষ্ণকিশোর সামনের সিট থেকে দ্রুত নেমে এসে নিজের হাতে পেছনের দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'আসুন—আসুন—'

নিচে নেমে এল তনিমা। তার মুখে হতচকিত ভাবটা লেগেই আছে। জনতাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এরা?'

কৃষ্ণকিশোর হাসলেন, 'আমাদের পার্টির ওয়ার্কার। আপনি আসবেন বলে সেই বারোটা থেকে ওয়েট করছে। এরাই দলের আসল শক্তি। আপনি আমাদের ক্যান্ডিডেট হওয়ায় ওরা যে কী এক্সাইটেড, বলে বোঝাতে পারব না। আপনার পপুলারিটি কত, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

দলের কর্মীরা এবার স্লোগান দিতে শুরু করল, 'তনিমাদি—'

'জিন্দাবাদ—'

'তনিমাদি—'

'জিন্দাবাদ—'

'এবারের নির্বাচনে জিতবে কে?'

'তনিমাদি, আবার কে?'

তনিমা লক্ষ করল, প্রতিটি দলীয় কর্মীর চোখমুখ উদ্দীপনায় চকচক করছে। সে যে আজ এখানে আসবে সেটা তাহলে গোপন নেই।

এদিকে দেবনাথও নেমে পড়েছিল। কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে তনিমারা মূল বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। দলের কর্মীরা মুহুর্মুহু স্লোগান দিতে দিতে সসম্ভ্রমে সরে সরে তাদের জন্য পথ করে দেয়।

গেটের পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর চওড়া চওড়া দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই শ্বেতপাথরের চবুতর, সেটার দু'ধারে বিরাট বিরাট পিলার।

চবুতরের ও-মাথায় মস্ত দরজা। কারুকাজ-করা দু'টো পাল্লা খোলা রয়েছে।

তনিমারা যখন দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, তার আসার খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে ভেতর দিক থেকে চলে এলেন সুবিমল। তাঁর সঙ্গে এসেছেন কয়েকজন বেশ বয়স্ক মানুষ। তনিমা আন্দাজ করে নিল, এঁরাও পার্টির বড় মাপের নেতা হবেন।

ওঁদের পেছনে আরও অনেকগুলো কৌতূহলী মুখ। তাদের ভেতর পরিমলকেও দেখা যাচ্ছে। সবার চোখেমুখে হাসির ঝলক। তনিমা পার্টি অফিসে আসায় ওঁরা যে ভীষণ খুশি সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

সুবিমল ঝানু রাজনৈতিক নেতা। আবেগ ও উচ্ছ্বাসে কখনও ভেসে যান না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল তাঁর হাতের মুঠোয়। হাসিমুখে বললেন, 'আসুন আসুন। ওয়েলকাম টু ইয়োর ওন পার্টি অফিস।' নিজের সঙ্গীদের দেখিয়ে বলেন, 'এঁরাও দলের সব ফেমাস লিডার। ভেতরে চলুন, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি—'

দরজার ওধারে মস্ত হল। সেটাকে ঘিরে প্রচুর ঘর। সেখানেও বেশ কিছু লোকজন রয়েছে। তারাও উৎসুক চোখে তনিমাকে দেখতে লাগল।

হল-ঘরের একধারে সিঁড়ি। ধাপ ভেঙে ভেঙে সুবিমলদের সঙ্গে দোতলায় উঠে এল তনিমা। এখানেও অবিকল একই মাপের হল, সেটা ঘিরেও প্রচুর ঘর। হলের আধাআধি জুড়ে পুরু গদির ওর ঢালাও ফরাস। তাছাড়া রয়েছে অনেকগুলো চেয়ার। দেওয়াল ঘেঁষে আট-দশটা স্টিলের আলমারি। এখানে ক'জন বৃদ্ধ এবং বয়স্ক মহিলাকে দেখা গেল। তাঁরা ফরাসে বসে কথা বলছিলেন। সুবিমল তাঁদের উদ্দেশে বললেন, 'তনিমাদেবী এসে গেছেন।'

প্রবীণ মানুষগুলি ব্যগ্রভাবে উঠে দাঁড়ালেন। এঁদের অনেকেরই মুখ চেনা। বিশেষ করে মল্লিনাথ দত্ত। টিভির পর্দার বহুবার দেখেছে। খবরের কাগজেও তাঁর ছবি এবং ভাষণ তো প্রায়ই ছাপা হত। ব্রিটিশ আমলের প্রাক্তন এই স্বাধীনতা সংগ্রামীটি সুবিমল রাহাদের পার্টির প্রার্থী হিসেবে গত চার-পাঁচটা লোকসভা নির্বাচনে কনটেস্ট করেছেন। মহিলাদের মধ্যে যাঁর বয়স সব চেয়ে বেশি—একহারা, মেদহীন চেহারা—তাঁকেও চিনতে অসুবিধে হল না। বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দালনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করেছেন। মণিমালা ভৌমিক। সবাই বলত—অগ্নিকন্যা। তিনি এখন এই পার্টির একজন এম. এল. এ। বিধানসভার মেম্বার।

সুবিমলরা হল-ঘরের মাঝখানে চলে এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'আগে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই—'

মণিমালা বলেন, 'ওর পরিচয়ের দরকার নেই। বাংলাদেশের মানুষ সবাই ওকে চেনে।' তনিমাকে বললেন, 'তোমাকে আপনি-টাপনি করে বলতে পারব না কিন্তু—'

'না না, সব দিক থেকে আপনার চেয়ে আমি কত ছোট। তুমি করেই তো বলবেন।'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। কোথায় বসবে—চেয়ারে, না নিচের ফরাসে?'

চেয়ারগুলো দেওয়ালের ধার ঘেঁষে রাখা আছে। ওখানে বসলে সবার সঙ্গে ভালো করে গল্প করা যাবে না। নেতা নেত্রী এবং দলীয় কর্মী মিলিয়ে যত জন, ততগুলো চেয়ার নেই। তনিমাকে নিয়ে জনকয়েক বসতে পারবে, বাকি সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে,এটা ভাবতেই ভীষণ খারাপ লাগছিল তার। বলল, 'নিচেই বসা যাক—'

তনিমাকে মাঝখানে রেখে সকলে তাকে ঘিরে বসে। বৃত্তাকারে। জায়গা কম, মানুষ বেশি। তাই অনেকেই ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভিড় কমাবার জন্য সুবিমল সাধারণ কর্মীদের বললেন, 'তনিমাদেবী বিশেষ দরকারে আজ এখানে এসেছেন। তোমরা নিচে গিয়ে বোসো। আমরা কাজের কথা

সেরে নিই। উনি এখন মাঝে মাঝেই আমাদের অফিসে আসবেন। পরে তোমাদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ হবে।'

দলীয় কর্মীরা বেশ শৃঙ্খলাপরায়ণ। মহানায়িকাকে খুব কাছ থেকে দেখা, তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলা, এ-জাতীয় ইচ্ছা কি ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সুবিমলের প্রবল ব্যক্তিত্ব। তাঁর নির্দেশ অমান্য করার সাহস কারও নেই। একটু হতাশ হয়েই তারা নিচে চলে যায়।

এখন হল-ঘরে যুব শাখার সেক্রেটারি ছাড়া বাকি যাঁরা রয়েছেন, সবাই প্রবীণ মানুষ। একে একে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন সুবিমল। প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং এম. পি মল্লিনাথ দত্ত ছাড়াও আরও দু'জন পুরনো বিপ্লবী রয়েছেন—গুণময় সামন্ত আর হেমন্তকুমার লাহিড়ি। এম. এল. এ মণিমালা ভৌমিক তো রয়েছেনই।

একের পর এক নাম আওড়ে যাচ্ছেন সুবিমল। প্রতুল ভট্টাচার্য, রমানাথ হালদার, প্রিয়গোপাল পাণ্ডে, সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা কেউ দলের সম্পাদক, কেউ কোষাধ্যক্ষ, কেউ মহিলা সেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

একদিনে ডজন ডজন নাম মনে রাখা অসম্ভব। দু-চারটে স্মৃতিতে থেকে গেল, বাকিগুলো মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। নিয়মিত এখানে যাতায়াত করলে সেগুলো স্থায়ীভাবে স্মৃতির ঝাঁপিতে ঢুকে যাবে।

তনিমা যে দলের টিকেটে নির্বাচনে কনটেস্ট করতে রাজি হয়েছে, এ জন্য বেশির ভাগ কর্মকর্তাই ভীষণ খুশি। তাঁরা আন্তরিকভাবেই জানালেন, তনিমাকে পেয়ে তাঁদের দলের শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেছে। এখন পুরনোদের পাশাপাশি নতুনদেরও তুলে আনা উচিত।

স্থবিরতা কাটিয়ে দলকে যদি গতিশীল করতে হয়, নতুন রক্তের সঞ্চার করতে হবে। জাগতিক নিয়মেই সেকেলে ধ্যানধারণা নিয়ে প্রাচীনরা চলে যাবেন, সতেজ চিন্তাভাবনা নিয়ে তাদের শূন্য স্থানগুলো পূরণ করবে টগবগে তরুণেরা। সুবিমল যেদিন প্রথম তনিমাদের ফ্ল্যাটে যায়, অনেকক্ষণ এ-সব নিয়ে সবিস্তার আলোচনা হয়েছে। পার্টি অফিসে এসে সেই কথাই আরেক বার শোনা গেল।

প্রাক্তন এম. পি মল্লিনাথ বললেন, 'তাহলে বলতে চাও, বুড়োদের আর জায়গা নেই? তারা বাতিল?' যদিও হেসে হেসে বলেছেন, তবু তারুণ্যের সংকীর্তনের মধ্যে সেটা বেসুরো ঠেকল।

তনিমা জানে, মল্লিনাথের বদলে এবারে লোকসভা নির্বাচনে তাকেই পার্টি টিকেট দিয়েছে। কানাঘুষো শুনেছে এ-জন্য মল্লিনাথ খুশি হননি। তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ জমেছে।

তনিমা বিব্রত বোধ করে। সে নিজে হাত কচলাতে কচলাতে পার্টি নেতাদের কাছে ঘুরে ঘুরে টিকেটের জন্য কাকুতিমিনতি করেনি। সুবিমলরাই বরং তার ফ্ল্যাটে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নির্বাচনে নামতে রাজি করিয়েছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, রাজনীতিতে আসাটা তার অনধিকার প্রবেশ। একজন বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে তাঁর ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সে টিকেট ছিনিয়ে নিয়েছে।

কথাগুলো মল্লিনাথ তনিমাকে বলেন নি। তবে টার্গেট যে সে-ই, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। প্রবল অস্বস্তি নিয়ে সে নতচোখে বসে থাকে।

অবশ্য সুবিমল ঠান্ডা মাথায় সামলে নেবার চেষ্টা করলেন। ব্যগ্রভাবে বলে ওঠেন, 'আপনারা বাতিল—এ-সব কী বলছেন মল্লিনাথদা! দেশের জন্যে আপনাদের মতো মানুষের সাক্রিফাইস কি কেউ ভুলতে পারবে? পার্টি যে এত বড় হয়েছে সেটা কাদের জন্যে?' একনাগাড়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'এই কিছুদিন আগে জন্ডিসে ভুগে উঠলেন। শরীর ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় ইলেকশনে কনটেস্ট করার ধকল নেওয়া সম্ভব হত না। আপনি সবসময় আমাদের মাথার ওপর আছেন। আশীর্বাদ করুন, তনিমা দেবী যেন জিতে বেরিয়ে আসতে পারেন।'

সুবিমল ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা। মিষ্টি মিষ্টি কথার মারপাঁচে মল্লিনাথকে শান্ত করতে চাইলেন। খানিকটা ড্যামজ কন্ট্রোলের ঢঙে।

মল্লিনাথ মৃদু হাসেন। 'তনিমা আমাদের ক্যান্ডিডেট। আমার নাতনির বয়সি হবে। আশীর্বাদ তো করতেই হবে।'

তনিমা এতক্ষণ চোখের কোণ দিয়ে মল্লিনাথকে লক্ষ করছিল। বলল, 'শুধু আশীর্বাদ করলেই হবে না। ইলেকশন ক্যামপেনের সময় আমার সঙ্গে থাকবেন। আমি একেবারে নতুন। আপনার গাইডেন্স ছাড়া এক পাও চলতে পারব না।'

সুবিমল এবং পার্টির অন্য নেতারা তনিমার কথা শুনতে শুনতে যতটা মুগ্ধ, ঠিক ততটাই চমৎকৃত। মেয়েটা শুধু চটকদার বা গ্ল্যামারসর্বস্ব নয়, তার মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ সারবস্তুও রয়েছে। মল্লিনাথের সঙ্গে দু-একটা কথা বলেই সে আঁচ করে নিয়েছে, এবার টিকেট না পাওয়ায় প্রাক্তন এম. পি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীটির মনে চাপা অসন্তোষ রয়েছে। এঁকে খুশি রাখা দরকার। রাজনীতি এমন একটা যুদ্ধ যেখানে, কোনও একজনের পক্ষে, সে যত বিখ্যাতই হোক, জেতা অসম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন বিশাল সুশৃঙ্খল একটি বাহিনী যার প্রতিটি বিভাগে থাকবেন এক-এক জন নিপুণ সেনানায়ক। তাঁরাই ভোটের রণকৌশল ঠিক করবেন। মল্লিনাথ মুখ ফিরিয়ে থাকলে মুশকিল হয়ে যেতে পারে।

মল্লিনাথের হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ভুরু দু'টো উঁচুতে তুলে বললেন, 'তুমি বেশ বুদ্ধিমতী। ঠিক আছে, যখন চাইছ প্রচারের সময় তোমার সঙ্গে থাকব। সুবিমলের কাছে তো শুনলে, মাঝখানে খুব ভুগেছি। যথেষ্ট বয়েসও হয়েছে। রোজ পদযাত্রা কি মিটিং টিটিং করা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে বেরুব।'

হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে গেছে, এমন একটা ভাব করে তনিমা বলে, 'তা হলেই হবে।' আপনি একদিনও যদি সঙ্গে থাকেন, সেটা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। আমার মনের জোর কতটা যে বেড়ে যাবে তা আমিই জানি।'

মল্লিনাথ হেসে হেসে বললেন, 'ভাল অভিনেত্রী তো। চমৎকার কথা বলতে পার।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মণিমালা বললেন, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ তনিমা?'

কিসের কথা বলছেন মণিমালা, বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে তনিমা।

মণিমালা জানালেন, দেশের জনসংখ্যার প্রায় আধাআধি হল মেয়েরা। অথচ কোনও রাজনৈতিক দলই দু-চারজনের বেশি মহিলাকে নির্বাচনে টিকেট দেয় না। এবারের ইলেকশনে তাঁদের পার্টি সমাজের নানা ক্ষেত্র থেকে চোদ্দজনকে বেছে নিয়ে ইলেকশনে নামাচ্ছে। প্রার্থীদের শতকরা তেত্রিশ ভাগই মেয়ে। দেশের অন্য কোনও প্রভিন্সেই এতজনকে টিকেট দেওয়া হয়নি। এটা সর্বভারতীয় রেকর্ড।

মণিমালা বলতে লাগলেন, 'পলিটিক্যাল পার্টিগুলো সম্পর্কে অনেকদিনের পুরনো অভিযোগটা এখন আর আমাদের সম্বন্ধে কেউ তুলতে পারবে না। আঙুল উঁচিয়ে বলতে পারবে না তোমাদের মেল-ডমিনেটেড পার্টি। তোমার মতো পপুলার, ট্যালেন্টেড একজনকে পেয়ে কী উপকার যে হয়েছে, বলে বোঝাতে পারব না।' তিনি জানালেন, তনিমার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গলের মহিলা ভোটাররা তাঁদের পার্টি সম্পর্কে অনেক বেশি আগ্রহী হবে। তনিমাকে ভোট তো দেবেই। মণিমালার ধারণা, তাঁদের অন্য মহিলা ক্যান্ডিডেটরাও মেয়েদের প্রচুর ভোট পাবে।

এ-সব শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু কী উত্তরই বা দেওয়া যায়? বিনীতভাবে সে বসে থাকে।

পার্টির অন্য নেতারাও শতভাবে বুঝিয়ে দিলেন, তনিমাকে পেয়ে তাঁরা নানা দিক থেকে লাভবান। এবারের নির্বাচনে পার্টি আগের আগের বারের তুলনায় অনেক বেশি সিট পাবে। কেন না একজন বিখ্যাত কেউ, বিশেষ করে গ্ল্যামার জগতের সুপারস্টারকে কোনও পার্টি নির্বাচনে নামালে লক্ষ লক্ষ মানুষের নজর এসে পড়ে। ভোটের বাক্সে তার সুফল পাওয়া যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধুই গুণকীর্তন। তার মধ্যে চা এবং প্রচুর সন্দেশ, গুলাবজামুন, প্যাঁড়া, কাজুবাদাম, কেক, প্যাস্ট্রি এসে গেল। বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও চা ছাড়া অন্য কিছুই ছুঁল না তনিমা।

পরিচয়-পর্ব শেষ হয়ে গেছে। চা খাওয়া হয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়বে যখন ভাবছে, সেই সময় হল-ঘরের দরজার সামনে গোলমাল শোনা গেল। চমকে সেদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, ক্যামেরা ট্যামেরা নিয়ে মিডিয়ার লোকজনেরা হানা দিয়েছে। তারা ভেতরে ঢুকতে চায়, পার্টির কর্মীরা তাদের ঠেকিয়ে রাখছে। এই নিয়ে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, চেঁচামচি।

সুবিমলরা খবরের কাগজ, টিভি বা রেডিও, কারুকেই খবর দেননি। তাঁদের ইচ্ছা ছিল, পুরোপুরি ঘরোয়াভাবে তনিমার সঙ্গে পার্টির কর্মী এবং নেতাদের আলাপ করিয়ে গল্পটল্প করা। সম্পূর্ণ আড্ডার মেজাজে। তাঁরা প্রচার চাননি। রিপোর্টাররা পাপারাজিরা এসে হামলা চালাক তা মোটেও কাম্য ছিল না।

কিন্তু তনিমার মতো একজন সুপারস্টারের গতিবিধি কি আর অজানা থাকে? মিডিয়ার লোকেরা সর্বক্ষণ ওত পেতে আছে। অদম্য তাদের উৎসাহ। বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক তারা এখানে হাজির হয়েছে। তাদের খবর চাই। ফোটো চাই। টাটকা, সেনসেশনাল এমন সব খবর, এমন সব ফোটো যা পাঠক বা দর্শকদের স্নায়ুগুলোকে চনমনে করে তোলে।

প্রথমত ফিল্মের মহানায়িকা, তার ওপর পলিটিক্যাল পার্টির অফিস। রাজনীতির সঙ্গে গ্ল্যামারের মিশ্রণ। দু'টো মিলিয়ে দুর্দান্ত চমক। প্রচণ্ড শিহরন। এইরকম একটা অঙ্ক কষে মিডিয়ার লোকদের তাই হানাদারি।

পার্টির কর্মীরা চিৎকার করছিল, 'আপনারা চলে যান। চলে যান। কেউ আপনাদের এখানে ডাকেনি।'

গলা আরও চড়িয়ে দেয় মিডিয়ার লোকেরা, 'আমরা তনিমা দেবীর সঙ্গে কথা বলব। ভেতরে যেতে দিন, ভেতরে যেতে দিন—'

ত্বরিত পায়ে উঠে পড়লেন সুবিমল কৃষ্ণকিশোর এবং আরও দু-একজন প্রবীণ নেতা। দলীয় কর্মীরা উত্তেজিত, মিডিয়ার লোকেরা নাছোড়বান্দা। ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।

মিডিয়াকে চটালে রাজনৈতিক দলগুলোর চলে না। আবার খবরের জন্য সাংবাদিকদের পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর দ্বারস্থ হতে হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা সবাই মেনে নিয়েছে।

সুবিমল অত্যন্ত বিচক্ষণ। সবসময় মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জানেন। স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'কী ব্যাপার ভাই?'

তিনি শুধু বিখ্যাত জননেতাই নন, চমৎকার মানুষও। কোনও কারণে রূঢ় হন না। মিডিয়ার লোকেরা সবাই তাঁকে চেনে, শ্রদ্ধাও করে। গলা মিলিয়ে তারা বলল, 'স্যার, তনিমা দেবী এখানে এসেছেন, খবরটা পেয়েই আমরা চলে এসেছি। ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই—'

সুবিমল বললেন, 'উনি ব্যক্তিগত কাজে এসেছেন। এখানে বাইরের কারও পক্ষে ওঁর সঙ্গে কথা বলার অসুবিধে আছে—'

হাতজোড় করে কাকুতিমিনতি করতে থাকে সাংবাদিকরা, 'স্যার, আমরা পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেব না। ওই তো উনি ওখানে বসে আছেন। কাইন্ডলি আমাদের ভেতরে যাবার পারমিশান দিন।'

সুবিমল পালটা হাতজোড় করেন, 'মাপ করবেন, আজ কোনওভাবেই সেটা সম্ভব নয়।'

'প্লিজ স্যার, প্লিজ—'

'দেখুন, আপনাদের সঙ্গে সবসময় আমি কো-অপারেট করি। আজ দয়া করে আর অনুরোধ করবেন না। আপনারা এখন আসুন। আমাদের কাজ করতে দিন।'

মিডিয়ার লোকেরা হতাশ। সুবিমল যখন 'না' বলেছেন, সেটা কোনওভাবেই নড়চড় হবে না। বাংলা ছবির মহানায়িকা একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের দপ্তরে চা খেতে কি খোশগল্প করতে এসেছেন, এটা ভাবাই যায় না। রিপোর্টাররা একটা চমকদার স্টোরির আশায় ছুটে এসেছিল। তাদের যাবতীয় উদ্দীপনা লহমায় মিইয়ে যায়।

তবু তারই ভেতর একটি চৌকশ সাংবাদিক বলে ওঠে, 'ঠিক আছ স্যার, আমরা তনিমা দেবীর কাছে যাচ্ছি না। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? আশা করি এতে আপনার আপত্তি হবে না।'

একটু চুপ করে থাকেন সুবিমল। তারপর বলেন, 'কী কথা?'

'শোনা যাচ্ছে, তনিমাদেবী পলিটিকসে জয়েন করছেন। আপনাদের পার্টির ক্যান্ডিডেট হিসেবে এবারের ইলেকশনে কনটেস্ট করবেন। কথাটা কি ঠিক?'

তনিমাকে দলের প্রার্থী হিসেবে নামানোর ব্যাপারটা এতদিন গোপন রাখতে চেয়েছেন সুবিমলরা। পাছে চাউর হয়ে যায় সেই কারণে তাঁকে আগে কখনও পার্টির অফিসে নিয়ে আসেননি। নিজেরাই তাঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন। প্রস্তুতি চলেছে নিঃশব্দে, লোকচক্ষুর আড়ালে। মিডিয়ার লোকেরা যাতে ঘুণাক্ষরে আঁচ করতে না পারে, সেদিকে তাঁদের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সাংবাদিকদের প্রবল ঘ্রাণশক্তি। ওরা ঠিক গন্ধ পেয়ে যায়।

সুবিমল হেসে হেসে বললেন, 'যদি তেমন কিছু হয়, আপনাদের সবাইকে ইনভাইট করে প্রেস কনফারেন্স করব। সেখানে তনিমাদেবী অবশ্যই থাকবেন।'

'তাহলে এটাই ধরে নিচ্ছি, তনিমাদেবীর আপনাদের ক্যান্ডিডেট হওয়াটা অস্বীকার করছেন না।'

এই রিপোর্টারটিকে অনেকদিন ধরেই দেখছেন সুবিমল। তার কথাবার্তায় থাকে বুদ্ধির ঝলক। তুখোড় সাংবাদিক হতে গেলে যা যা দরকার, সব ওর মধ্যে রয়েছে। নানা প্রশ্নের মারপ্যাঁচে আসল ব্যাপারটা কৌশলে সে বার করে নিতে পারে। ওর নামটাও জানা। অশোক—অশোক দত্ত।

অশোকের কাঁধে একটা হাত রেখে হেসে হেসে সুবিমল বলেন, 'একটু সবুর করো না। তেমন কিছু হলে জানতেই তো পারবে।'

অশোক বলল, 'যা জানার জেনে গেছি। কালকের কাগজে নিউজটা কিন্তু করে দিচ্ছি—'

'করলে তো ঠেকাতে পারব না। তবে না মিললে কিন্তু প্রতিবাদ করব।'

'প্রতিবাদটাও ছেপে দেব।'

মিডিয়ার লোকেদের বিদায় করে তনিমাদের কাছে চলে এলেন সুবিমলরা।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল। তারপর তনিমা এবং দেবনাথ ফিরে যাবার জন্য যখন উঠে পড়েছে সেই সময় সুবিমল বললেন, 'ক্যান্ডিডেটদের লিস্টটা আমরা অফিসিয়ালি যখন জানাব, মিডিয়া কিন্তু আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। ইন্টারভিউর জন্যে হামলে পড়বে, ছবি তুলতে চাইবে।'

তার সামান্য একটু নমুনা খানিক আগেই লক্ষ করেছে তনিমা। নেহাত সুবিমল ছিলেন, নিপুণভাবে সব সামলে দিয়েছেন। বিষয়টা সিনেমা হলে সমস্যা ছিল না। ষোল-সতেরো বছর এই নিয়ে পড়ে আছে। ফিল্ম সম্বন্ধে যা-ই জিজ্ঞেস করা হোক, তাকে কাবু করা যাবে না। কিন্তু রাজনীতিতে সে একেবারেই আনকোরা। অনির্বাণ এবং দীপেশ যথেষ্ট তালিম দিলেও সাংবাদিকদের কে কী ধরনের প্রশ্নের ফাঁদে ফেলে দেবে, কে জানে। একজন নির্বাচন প্রার্থীকে সারাক্ষণ সপ্রতিভ থাকতে হয়। উত্তর দিতে গিয়ে গুলিয়ে মুলিয়ে ফেললে সেটা ভারি বিশ্রী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কাগজ-টাগজে এমন লেখালেখি হবে যে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।

তনিমা বলল, 'চিন্তার বিষয়। রাজনীতিতে এসেছি, অথচ জার্নালিস্টরা আমাকে ছেড়ে দেবে, তা তো হয় না। এদের ঠেকাব কী করে?'

সুবিমল বললেন, 'আলাদাভাবে প্রেসের লোকেরা কেউ দেখা করতে চাইলে রাজি হবেন না। আপনাকে নিয়ে আমরা একটা প্রেস কনফারেন্স করব। সেখানে

পার্টির অনেকে থাকবে। সবাইকে জানিয়ে দেবেন, যা বলার প্রেস কনফারেন্সেই বলবেন।'

তনিমা বুঝতে পারছে, সাংবাদিক সম্মেলনে সে একা থাকবে না। ঢাল হিসেবে পার্টির নেতারা, বিশেষ করে সুবিমল রাহা তাকে আগলে আগলে রাখবেন। কেউ বেয়াড়া কোনও প্রশ্ন করলে উনিই তার জবাব দেবেন কিংবা উত্তরটা কী হওয়া উচিত তার সংকেত দিয়ে সাহায্য করবেন।

তনিমার টেনশনটা অনেকখানি কেটে যায়। সে বলে, 'ঠিক আছে—'

নয়

সুবিমলরা আগামী নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছেন। খবরের কাগজ, রেডিও এবং টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেল সেগুলো পশ্চিম বাংলার মানুষকে সবিস্তার জানিয়েও দিয়েছে। তারপর থেকে ফোন বেজেই চলেছে অবিরল।

তনিমাদের সবসুদ্ধ তিনটে ফোন। দু'টো ল্যান্ড লাইনের। একটা মোবাইল। মোবাইলটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। অন্য দু'টো থামছেই না।

কত মানুষের যে ফোন! এরা তনিমার ফ্যান। তাছাড়া মিডিয়ার লোকজন। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ডিরেক্টর, প্রডিউসার, আর্টিস্ট থেকে সাধারণ কলাকুশলী। ফোনগুলো অবশ্য তনিমা ধরছে না। সব সামলাচ্ছে দেবনাথ।

তনিমা যে রাজনীতিতে আসছে, আগামী নির্বাচনে কনটেস্ট করবে, সাংবাদিকরা তার আভাস আগেই পেয়েছিল। কিন্তু অন্য সবাই হতবাক।

তনিমার যে ফ্যানেরা বহু বছর ধরে তার ছবি দেখে আসছে তাদের বেশির ভাগই হতাশ। তারা বলে, 'দিদি এম. পি হবেন, মন্ত্রী হবেন, সিনেমায় আর তাঁকে দেখা যাবে না। বেঙ্গলি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। ওঁকে বলুন ইলেকশন থেকে নামটা যেন উইথড্র করে নেন।'

দেবনাথ তাদের ভরসা দেয়, 'তনিমাদেবীর কাছে আসল ব্যাপারটা হল ফিল্ম। রাজনীতি নয়। এম. পি-ই হোন আর মন্ত্রীই হোন, ফিল্ম উনি ছাড়বেন না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

অনুরাগী ভক্তদের সংশয় কাটে না। তারা রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে অনেক খবর রাখে। বলে 'এম. পি হলে বেশির ভাগ সময়ই তো ওঁকে দিল্লিতে থাকতে হবে। কী করে ছবি করার সময় পাবেন?'

দেবনাথ ধুরন্ধর লোক। কী উত্তর দিলে লোকে খুশি হবে, সে তা ভালোই জানে। গলায় মাখন ঢেলে খুব মোলায়েম করে বলে, 'আজ উনি যেখানে

পৌঁছেছেন, আপনারা পেছনে না থাকলে তা কখনই সম্ভব হত না। আপনারা যখন চাইছেন, ব্যস্ততার মধ্যেও কলকাতায় এসে ছবি ওঁকে করতেই হবে। ওঁর হয়ে আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি। তবে—'

'তবে কী?'

'আগের মতো অনেক ছবি হয়ত করতে পারবেন না। বেছে বেছে করবেন।'

এক দল ফ্যান অবশ্য ভীষণ খুশি। তারা বলে, 'পলিটিকস নোংরামিতে ভরে গেছে। দেশ জুড়ে খালি কোরাপশন আর কোরাপশন। দিদিকে বলবেন, পাজি বজ্জাতদের যেন টাইট করে দেয়।'

দেবনাথ আশ্বাস দেবার সুরে বলে, 'বলব—'

ফিল্ম টেকনিশিয়ানদের একটা দল একদিন এসে দেখা করল। তাদের আসাটা ঠেকানো যায় নি। বছরের পর বছর একসঙ্গে কাজ করেছে। বহুকালের সহকর্মী। এদের দাবি, 'বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কী হাল, আপনি তা ভালোই জানেন। বিশেষ করে আমাদের মতো টেকনিশিয়ানদের তো রোজই দেখছেন। আশা নেই, ভবিষ্যতের সিকিউরিটি নেই। দিল্লিতে গিয়ে আমাদের জন্যে কিছু একটা করবেন দিদি—'

অতি সাধারণ কলাকুশলীদের প্রতি তনিমার অপার সহানুভূতি। খুব আন্তরিকভাবেই সে বলে, 'নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।'

'আপনি চেষ্টা করলেই হবে।'

একজন অ্যাসিস্টান্ট মেক-অ্যাপ-ম্যান, যথেষ্ট বয়স হয়েছে, নাম নিবারণ মাইতি, বলল, 'দিদি, আমরা বেশির ভাগ ছোট টেকনিশিয়ানরা ভাড়া বাড়িতে থাকি। বাড়িওলা তিন বছর পর পর ভাড়া বাড়িয়েই চলছে। তার ওপর নানা রকমের উৎপাত। আজ হুমকি দিচ্ছে তুলে দেবে। কাল জল বন্ধ করছে। আমাদের জন্যে সস্তায় যদি মাথা গোঁজার একটা ব্যবস্থা করে দেন তো ছেলেপুলে নিয়ে বেঁচে যাব।'

সাধারণ কলাকুশলীদের বাসস্থানের সমস্যাটা ভালোই জানে তনিমা। সে ঠিক করে ফেলে, সুযোগ পেলে একটা কো-অপারেটিভ হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরির ব্যবস্থা করবে। বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা আমার মাথায় থাকবে। তবে সমস্ত কিছু নির্ভর করছে, আমি ইলেকশনে জিততে পারব কি না, তার ওপর।'

'আপনি জিতবেনই।'

শিল্পী প্রযোজক এবং পরিচালকদের তিনটে দলও আলাদা আলাদা এসে দেখা করে। এদেরও না বলা যায় না। নির্বাচনে তনিমা নেমেছে বটে, কিন্তু জিতে যে

যাবেই, জোর দিয়ে কি তা বলা যায়? ইলেকশনের বৈতরণী পেরুতে না পারলে ফিল্ম ছাড়া গতি নেই। তাই এদের অসন্তুষ্ট করা চলে না।

তিনটে দলই চায় তাকে মধ্যমণি করে কোনও বড় হোটেলে পার্টি দেয়। তনিমা হাতজোড় করে বলেছে, 'প্লিজ, এখন না। আগে জিতি। তারপর ও-সব ভাবা যাবে।'

তিনটে দলই তনিমার অ্যাপার্টমেন্টে প্রচুর খানাপিনা করে যাবার সময় বলেছে, 'এম. পি কি মন্ত্রী-টন্ত্রী হতে পারলে আমাদের দেখো—'

কীভাবে দেখবে, তনিমার জানা নেই। তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তার কাছে এই লোকগুলোর বিপুল প্রত্যাশা।

যারা তনিমাদের বিশাল হাই-রাইজের অন্য অ্যাপার্টমেন্টগুলোয় থাকে তারাও এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। তনিমার জন্য এখানকার বাসিন্দারা বিশেষভাবে গর্বিত। এরা অবশ্য কিছু চায় নি। নিছকই শুভ কামনা জানিয়ে গেছে।

চেনা-অচেনা মানুষের মধ্যে যার ফোনের জন্য তনিমা সবচেয়ে বেশি উন্মুখ হয়ে ছিল, সেটাও এসে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সন্দীপ বলেছে, 'তুমি যে ওয়ার্ল্ডের বিগেস্ট শো-বিজনেসে ঢুকে যাবে, ভাবতে পারিনি।'

ইলেকশন সম্পর্কে 'শো-বিজনেস' কথাটা আগে কি কেউ বলেছিল? তনিমা মনে করতে পারেনি। সে প্রথমটা একচোট হেসে তারপর বলেছে, 'তা ঢুকেই গেলাম।'

'ব্যাপারটা ঘটল কী করে?'

'ফোনে কি অত সব বলা যায়?'

'ঠিক আছে। কলকাতায় গিয়েই শোনা যাবে।'

খুশিতে চোখ-মুখ আলো হয়ে যায় তনিমার। বলেছে, 'তুমি কি এর মধ্যে কলকাতায় আসছ?'

সন্দীপ বলেছে, 'এক্ষুনি যাওয়া হবে না। প্রচণ্ড কাজের চাপ চলছে।'

আদুরে গলায় তনিমা বলেছে, 'প্লিজ, চলে এস। তুমি এলে ভীষণ ভাল লাগবে।'

পাঁচ ফিট দূরত্বে বসে নাক কুঁচকে দেবনাথ বলেছে, 'ছেনালি!' এই শব্দটা মাঝে মাঝেই আওড়ায় সে। টিপ্পনীটা অবশ্য গায়ে মাখে না তনিমা।

একটু নীরবতা।

তারপর সন্দীপ বলেছে, 'যে-ই তোমাকে পলিটিকসে টেনে আনুক, এক হিসেবে খারাপ করেনি। তোমাদের ফিল্মে টাকা আছে, গ্ল্যামার আছে, কিন্তু

পলিটিকসে ও দু'টো তো আছেই, তার সঙ্গে রয়েছে পাওয়ার। রাজনৈতিক শক্তিটাই আসল শক্তি। সেটা হাতে থাকলে হোল ওয়ার্ল্ড তোমার পায়ের তলায়।'

'যার পরামর্শে ইলেকশনে নেমেছি সে কাছেই বসে আছে— দেবনাথ।'

'ধুরন্ধর লোক। ফার-সাইট আছে।'

'তোমার কমপ্লিমেন্ট ওকে জানিয়ে দিচ্ছি।' ফোনের মুখ চেপে ধরে কথাগুলো দেবনাথকে শুনিয়েছে তনিমা।

দেবনাথ উত্তর দেয়নি।

ফের কথা শুরু হয়েছিল। সন্দীপ এবার বলেছে, 'এখন যেতে না পারলেও আশা করি তোমার ইলেকশনের সময় ক'দিন কলকাতায় কাটিয়ে আসতে পারব।'

'ফাইন।'

সব থেকে বেশি উৎপাত করেছে মিডিয়ার লোকজন। খবরের কাগজ আর অগুনতি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক এবং ফোটোগ্রাফাররা সকাল বিকেল সন্ধে, এমনকি মাঝরাতেও অবিরল ফোন করে গেছে। সবার গলায় এক সুর, এক আবেদন, একইরকম কাকুতিমিনতি। ম্যাডামকে বেশিক্ষণ তারা জ্বালাবে না। দু-চারটে কথা বলবে, একটা ছবি তুলবে, ব্যস। সুবিমলদের পার্টি অফিসে হানা দিয়ে সেদিনও এইভাবেই তারা আরজি জানিয়েছিল। দেবনাথ বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। সুবিমল রাহা যেমনটি শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন, তনিমার হয়ে তোতাপাখির মতো ঠিক তাই আওড়ে গেছে সে। 'প্লিজ, আপনারা একটু সবুর করুন, শিগ্‌গিরই প্রেস কনফারেন্স ডাকা হবে। তখন তনিমাদেবীকে যত ইচ্ছা প্রশ্ন করবেন। উনি উত্তর দেবেন।'

দশ

আজ পার্টি অফিসের দোতলার হল-ঘরে 'মিট দা প্রেস'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা চমৎকার সাজানো উঁচু মঞ্চের ওপর মধ্যমণি করে বসানো হয়েছে তনিমাকে। তার দু'পাশে সুবিমল রাহা, কৃষ্ণকিশোর তরফদার ছাড়াও রয়েছেন দলের প্রধান সব নেতারা। তনিমার ঠিক পেছনে দুই তুখোড় প্রোফেশনাল—অনির্বাণ এবং দীপেশ। সাংবাদিকদের দিক থেকে বেয়াড়া কোনও প্রশ্ন এলে তনিমা যদি বেকায়দায় পড়ে যায়, সামলাবার জন্য সুবিমলরা আছেন। তাঁরাও যদি আটকে যান, লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্সের জন্য রয়েছে অনির্বাণরা।

মঞ্চের সামনের দিকে বসে আছে সাংবাদিকরা। তাদের সবার হাতে নোটবুক এবং পেন। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান এবং খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফাররা কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে। প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলে তারা পটাপট ছবি তুলতে শুরু করবে। হল-ঘরের প্রতিটি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে দলের কর্মীরা। হুট করে অবাঞ্ছিত, উটকো কেউ ঢুকে পড়বে, তার উপায় নেই।

সুবিমল শুরু করলেন, 'নমস্কার। তনিমাদেবীকে আপনারা সবাই চেনেন। বাংলা সিনেমার তিনি মহানায়িকা। সারা দেশ জুড়ে তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুরাগী। তাঁর সম্বন্ধে সবাই এত বেশি খবর রাখেন যে বিশদভাবে তাঁর পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই।

'আপনারা জেনে গেছেন, আসন্ন নির্বাচনে তনিমাদেবী আমাদের দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ-সম্বন্ধে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতো মিডিয়াও বিশেষভাবে আগ্রহী। আপনারা আমাদের দলের অফিসে এবং তনিমাদেবীর কাছে অনবরত খোঁজখবর নিয়েছেন। আলাদা আলাদাভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। কিন্তু তনিমাদেবীর প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে তা একেবারেই সম্ভব হয়নি। সে-জন্যে তিনি এবং দলের সকলে আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা স্থির করে রেখেছিলাম, বিভিন্ন মাধ্যমের লোকজনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের সামনে তনিমাদেবীকে উপস্থিত করব। সেই উদ্দেশ্যে আজকের এই 'সাংবাদিক সম্মেলন'। আপনারা সবাই যে অনুগ্রহ করে এসেছেন, সে-জন্যে দলের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবার তনিমাদেবীর সঙ্গে কথা বলুন—'

একটি সাংবাদিক তনিমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি তো বাংলা ফিল্মের সুপারস্টার। ভীষণ ব্যস্ত আর্টিস্ট। হঠাৎ সিনেমা ছেড়ে রাজনীতিতে আসতে গেলেন কেন?'

তনিমা হাসিমুখে বলে, 'সিনেমা ছাড়ার প্রশ্নই নেই। আর রাজনীতিতে কেন এলাম? ডাক্তার ব্যারিস্টার বিজনেসম্যান অধ্যাপক—এঁরা যদি রাজনীতি করতে পারেন, একজন ফিল্ম আর্টিস্ট পারবে না কেন? তারাও তো সোসাইটির অঙ্গ। তাছাড়া, ফিল্ম অ্যাক্টররা পলিটিকস করতে পারবে না, সংবিধানে এমন কোনও নিষেধাজ্ঞা কি আছে?'

দ্বিতীয় সাংবাদিক।। 'পলিটিকসে যে কেউ আসতে পারে, এটা ঠিক। শুনতে পাই, রাজনীতিতে প্রচুর মধু। সেই কারণেই কি কেরিয়ার হিসেবে এখন এটা বেছে নিয়েছেন?'

তনিমা।। 'মধু বলতে টাকার কথা কি 'মিন' করছেন?'

দ্বিতীয় সাংবাদিক।। 'এক্‌জাক্টলি।'

তনিমা।। 'দেখুন, অভিনয় করে যা জমাতে পেরেছি, সারা জীবন আর কিছু না করলেও চলবে। আমি সাধারণ মানুষের জন্যে কিছু করতে চাই।'

তৃতীয় সাংবাদিক।। 'সাধারণ মানুষের জন্যে পলিটিসিয়ানদের তো ঘুম নেই। দুঃখে সারাক্ষণ বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু ইলেকশনের পর ইলেকশন আসে, কমন পিপল যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকে। আপনিও কি অন্যদের মতো বাঁধা বুলি আওড়াচ্ছেন?'

তনিমা।। 'আমাকে কিছু দিন সময় দিন। তারপর দেখবেন আমি অন্য সবার দলে পড়ি কিনা।'

দ্বিতীয় সাংবাদিক।। 'যিনিই ইলেকশনে জেতেন তিনিই সময় চান। এই সময়টা অনন্তকাল হয়ে যায়। কাজ কিছুই হয় না। দেখতে দেখতে আরেকটা ইলেকশন এসে যায়।'

তনিমা।। 'ঠিকই বলছেন। তবে ব্যতিক্রম তো কিছু থাকেই। আপনারা, মানে মিডিয়ার লোকেরা তো এক ধরনের গার্জেন অফ সোসাইটি। আমার ওপর লক্ষ রাখবেন। দেখবেন, কিছু কাজ আমি করতে পেরেছি কিনা।'

দ্বিতীয় সাংবাদিক আর কোনও প্রশ্ন করে না।

তৃতীয় সাংবাদিক।। 'দেশের একটা বিশাল সমস্যা হল কোরাপশন—ভ্রষ্টাচার। এটা নির্মূল করা দরকার। নইলে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

তনিমা।। 'স্বীকার করছি। কিন্তু কোরাপশন তো একদিনে এত বড় আকার নেয়নি। রাতারাতি এর শেকড় উপড়ে ফেলা যাবে না। সময় লাগবে।'

চতুর্থ সাংবাদিক।। 'ইন্ডিয়ার পপুললেশন হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। আর দশ-পনেরো বছরে মানুষের দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। খাবেই বা কী? 'পপুলেশন এক্সপ্লোশন', মানে জন বিস্ফোরণ কীভাবে ঠেকানো যায়, ভেবেছেন কি?'

তনিমা।। 'পপুলেশন যেভাবে বাড়ছে সেটা ভীষণ চিন্তার ব্যাপার। না, এটা আটকানোর জন্যে কিছুই ভেবে উঠতে পারিনি। আমার প্রথম চিন্তা ইলেকশনে জেতা। এম. পি না হতে পারলে পার্লামেন্টে যেতে পারব না। সেখানে না গেলে কেউ আমার কথা কানেও তুলবে না। আগে জিতি, তারপর এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে পরিকল্পনা করার কথা ভাবা যাবে।'

পঞ্চম সাংবাদিক।। 'রিসেন্টলি একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি দু'মিনিটে একজন বড় পলিটিসিয়ানের মুখ কি নাম হয় টিভি'র পর্দায়, নইলে খবরের কাগজে কিংবা বাড়ির দেওয়ালে কি পোস্টারে দেখা যায়। প্রতি সাতদিনে মিনিমাম একবার তিনি কোনও ফ্যাশন শো, কি ফিল্মের মহরত, কিংবা নাটকের শত রজনী পূর্ণ

হওয়া অনুষ্ঠানে সভাপতি বা প্রধান অতিথির ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে পাঁচ বছরে একবারের বেশি তাঁকে দেখা যায় না। এটা কি আপনি মানেন?'

তনিমা।। 'মানামানির প্রশ্নটা পরে। আপনি ঠিক কী জানতে চাইছেন?'

পঞ্চম সাংবাদিক।। 'পাঁচ বছর পর পর তো ইলেকশন। ধরুন আপনি এবার জিতে গেলেন। নেক্সট ইলেকশনের আগে ক'বার নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে যাবেন?'

তনিমা পলকহীন সাংবাদিকটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'ক'বার গেলে আপনি খুশি হবেন?'

পঞ্চম সাংবাদিক।। 'আমার খুশি হওয়াটা জরুরি নয়। আপনার ভোটারদের সন্তুষ্ট রাখাটাই আসল ব্যাপার।'

সাত নম্বর সাংবাদিক।। 'আপনি কতদিন পর পর আপনার কনস্টিটিউয়েন্সিতে যেতে পারবেন বলে মনে হয়?'

তনিমা ।। 'যতদিন পর পর গেলে এলাকার মানুষের ভালো হবে।' সে বলতে লাগল, 'ইন ফ্যাক্ট উইকে একদিন কি ফোর্ট নাইটে একদিন বা মাসে একদিন—এরকম ধরাবাঁধা কোনও রুটিন নয়। যখনই দরকার হবে তখনই যাব।'

গোড়ার দিকে কিছুটা নার্ভাস থাকলেও, এখন স্নায়ুর ওপর সেই চাপটা আর নেই। ঝানু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর যেভাবে চটপট দিয়ে যাচ্ছে, তাতে নিজেই অবাক তনিমা। তার ওপর আজ কি অলৌকিক কিছু ভর করেছে?

অবাক শুধু সে নিজেই নয়, সুবিমল রাহা থেকে শুরু করে পার্টির সব বড় বড় নেতারা তো বটেই, এমনকি যে দুই প্রোফেশনাল তালিম দিয়ে দিয়ে তাকে চৌকশ করে তুলছে তারাও রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছে। প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকরা কী ধরনের প্রশ্ন করতে পারে এবং সেগুলোর জবাব কী হওয়া উচিত, তনিমাকে তা শিখিয়ে পড়িয়ে মোটামুটি রপ্ত করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে-সবের বাইরেও সাংবাদিকরা এমন সব কামান দাগছে যা আচ্ছা আচ্ছা নেতাদের পক্ষেও সামলানো মুশকিল। অথচ তনিমা রাজনীতির 'র' জানে না, কিন্তু কত সহজে একের পর এক উত্তর দিয়ে চলেছে। যেন জন্মের পর থেকেই রাজনীতি করে চলেছে। ব্যাপারটা তার কাছে একেবারেই জলভাত।

কামান দাগা শেষ হয়নি। মিডিয়ার লোকেরা দেশের হাজারটা সমস্যার কথা তুলল। সীমান্ত পেরিয়ে চোরা অনুপ্রবেশ, জঙ্গি আন্দোলন, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, বৈদেশিক নীতি কী হওয়া উচিত, পাকিস্তানের সঙ্গে কিভাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি করা যায়, জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম ঠেকানোর উপায়, কাশ্মির সমস্যার সমাধান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে হেসে হেসে তনিমা বলে, 'আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

সাংবাদিকরা কোরাসে বলে উঠেছে, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'আমাদের দেশে কী ধরনের সরকার চালু আছে?'

'কেন, সেকুলার ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট। ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার।'

'কারেক্ট। আমি যদি নির্বাচনে জিততে পারি, আমাকে কি ডিক্টেটর বানিয়ে দেওয়া হবে?'

মিডিয়ার লোকেরা হতবাক তাকিয়ে আছে। তনিমার হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সামনাসামনি যারা তার দিকে অস্ত্র তাক করে বসে দিল তাদের বদলে-যাওয়া মুখগুলি দেখতে দেখতে বেশ মজাই লাগে তার। সে হালকা গলায় বলে, 'পার্লামেন্টের পাঁচশো চল্লিশ-বেয়াল্লিশ জন মেম্বারের ভেতর আমি একজন। আপনারা যে-সব বিরাট বিরাট সমস্যার কথা বললেন, সেগুলো কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কারও একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব? যদি সে একনায়ক না হয়?'

সাংবাদিকরা তনিমাকে বাজিয়ে নিতে চেয়েছিল। উলটে সে তাদের ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। কেউ উত্তর দেয় না।

তনিমা থামেনি, 'ইলেকশনের পর নতুন গভর্নমেন্ট তৈরি হবে। রুলিং পার্টি আর অপোজিশন মিলিয়ে ঠিক করবে প্রবলেমগুলোর সমাধান কী করে করা যায়। সেখানে আমার বক্তব্যটাই শুধু বলতে পারি। তার বেশি কিছু নয়।' একটু ভেবে বলে, 'যদি আমাদের পার্টি গভর্নমেন্ট ফর্ম করতে পারে, তবু কিছু করা যাবে। আর যদি মাইনোরিটি হয়ে অপোজিশনে বসতে হয়, হইচই বাধানো ছাড়া তেমন কিছু করা কি সম্ভব? আপনারাই বলুন—'

মিডিয়ার লোকেরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে।

প্রেস কনফারেন্সের পর সুবিমল এবং দলের অন্য সব নেতা প্রশংসার ঢল বইয়ে দিলেন। মিডিয়ার লোকেদের বিস্ময় আর কাটছিল না। রাজনীতিতে একেবারে নতুন, এমন একজন ক্যান্ডিডেটের কাছে এতটা 'ম্যাচিওরিটি' কেউ আশা করেনি। যে কৌশলে সাংবাদিকদের সে ঠেকিয়েছে, যেভাবে তার ঘাড়ে তাদের চড়তে দেয়নি, তাতে সবার তাক লেগে গেছে।

আজকাল তো দু-চারজন বাদে নানা পার্টি যাদের টিকেট দেয় তাদের বেশির ভাগই না জানে দেশের ইতিহাস, না বোঝে অর্থনীতি। বিশাল এই দেশের সাধারণ মানুষের এই বেঁচে থাকার যুদ্ধ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে না আছে লেশমাত্র ধারণা। শিক্ষাদীক্ষা নেই, ভালো করে কথা বলতে পারে না। পার্লামেন্টে গিয়ে

তারা পাঁচ বছর মূক-বধিরের ভূমিকা পালন করে যায়। তাদের সঙ্গে তনিমার কোনও তুলনাই চলে না।

মিডিয়ার লোকেরা একমত, সুবিমলদের পার্টি একজন ভালো ক্যান্ডিডেটকে মনোনয়ন দিয়েছে। আশা করা যায়, নির্বাচিত হলে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দুরূহ সমস্যাগুলো সংসদে তুলে ধরতে পারবে তনিমা।

এগারো

প্রেস কনফারেন্সের দু'দিন পর অনির্বাণ আর দীপেশ একজন ফোটোগ্রাফার আর একজন মেক-আপম্যানকে সঙ্গে করে তনিমার অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির। হালকা সাজে তাকে সাজিয়ে, সাধারণ শাড়ি-টাড়ি পরিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তার অনেকগুলো ছবি তোলা হল। কোনও ছবিতে হাতজোড় করে সে দাঁড়িয়ে আছে, কোনওটায় তার মুখে মৃদু হাসি। ফোটোগুলোতে যাতে ভারতীয় নারীর চিরকালীন, কোমল একটা ইমেজ ফুটে ওঠে সেদিকে সতর্ক নজর ছিল অনির্বাণদের।

ফোটো তোলা হয়ে গেলে তনিমা জিজ্ঞেস করে, 'আমার এতসব ছবি দিয়ে কী হবে?'

অনির্বাণরা জানায়, ছবিগুলো থেকে দু-তিনটে বেছে নিয়ে নির্বাচনী পোস্টার ছাপা হবে। বড় বড় কাট-আউট তৈরি করে নির্বাচন কেন্দ্রের নানা জায়গায় দাঁড় করানো হবে। ইলেকশনের সময় হায়দ্রাবাদ চেন্নাই মাদুরাই বাঙ্গালোর মুম্বাইতে যেমন করা হয়, অবিকল সেই কায়দায়।

ফোটো তোলানো হয়ে যাবার পর পঞ্জিকায় শুভ দিন দেখে বিশাল মিছিল করে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে নিয়ে যাওয়া হল তনিমাকে। মোট এগারোটা টাটা সুমোর কনভয়। সেগুলোর মাঝখানেরটায় সুবিমল রাহার মতো বড়ো দলীয় নেতাদের পাশে বসে আছে তনিমা।

কনভয়ের সামনের দিকে দলের অজস্র কর্মী। তারা অবশ্য পদাতিক। দু'টো লাইন করে সুশৃঙ্খলভাবে হেঁটে চলেছে। ওদের হাতে হাতে তনিমার ছবিওলা পোস্টার, পতাকা আর মুখে মুহুর্মুহু স্লোগান।

'তনিমাদেবী—'

'জিন্দাবাদ!'

'নির্বাচনে জিতবে কে?'

'তনিমাদেবী, আবার কে?'

'তনিমাদেবী—'

'যুগ যুগ জিও।'

মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর তুমুল ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। নির্বাচনী প্রচারে নামিয়ে দেওয়া হল তনিমাকে।

শুরুটা হল এইভাবে। এক ছুটির দিনে আটটা সাড়ে-আটটা নাগাদ অনির্বাণ আর দীপেশ এল। সঙ্গে সেই মেক-আপম্যানটা।

আধঘণ্টার ভেতর সাজসজ্জা শেষ। তনিমাকে এখন দেখলে মনে হবে, পাশের বাড়ির মেয়ে। তেমনি ঘরোয়া। তেমনি স্নিগ্ধ। মুখে তেমনি আপন-করা কোমল একটা ভাব।

অনির্বাণ বলল, 'আপনাকে নতুন করে আর কিছু বলার নেই। সেদিন যেভাবে প্রেস মিটটা সামলেছেন তাতে আমাদের তাক লেগে গেছে। একটা কথা মাথায় রাখবেন, আমাদের অপোনেন্ট পার্টি আপনার এগেনস্টে পুরুষ ক্যান্ডিডেট দাঁড় করিয়েছে। ভদ্রলোকের একটা বড় ডিস-অ্যাডভান্টেজ আছে।'

তনিমা অবাক, 'কিসের ডিস-অ্যাডভান্টেজ?'

দীপেশ বলল, 'পুরুষ হওয়ায় তাঁর পক্ষে কোনও বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়া অসম্ভব। সেদিক থেকে আপনার বিরাট সুবিধে।'

তনিমার ধন্দ কাটে নি। সে জিজ্ঞেস করে, 'আমরা দু'জনেই ইলেকশনে কনটেস্ট করছি। প্রচার করছি। প্রচার ট্রচার সব একই রকম হবে। আমার এক্সট্রা সুবিধেটা কোথায়?'

'সুবিধেটা হল, আপনি একজন মহিলা। ক্যামপেনের সময় আপনি বেডরুম, কিচেন অব্দি চলে যেতে পারবেন, যেটা একজন পুরুষের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।'

দীপেশ বলল, 'আপনার কনস্টিটিউয়েন্সিতে ফর্টি এইট পারসেন্ট মহিলা ভোটার। একটু চেষ্টা করলে এই ফর্টি এইট থেকে মিনিমাম ফর্টি পারসেন্ট পেয়ে যেতে পারেন। এই ভোটটা খুব ভাইটাল।'

মেধাবী, মনোযোগী ছাত্রীর মতো সমস্ত শুনে যায় তনিমা। তরল গলায় বলে, 'আপনারা যা বললেন বুঝতে পেরেছি। ষোল-সতেরো বছর ধরে ফিল্মে ছলাকলা তো কম করলাম না। মেয়ে ভোটারদের মাথা কি ঘুরিয়ে দিতে পারব না? খুব পারব। লাইন দিয়ে তারা আমাকে ভোট দিয়ে যাবে।'

অনির্বাণ বলল, 'অপোনেন্ট পার্টির ক্যান্ডিডেটটি কিন্তু ভীষণ চতুর। পঁচিশ তিরিশ বছর কনটেস্ট করে চলেছে। ভোট করে করে তার হাড় পেকে গেছে।

বেগতিক বুঝলে নিজের স্ত্রীকে ক্যামপেনে নামিয়ে দেবে। তাঁর পেছন পেছন তিনিও অন্তঃপুরে ঢুকে পড়বেন।'

প্রেস কনফারেন্সের পর থেকেই আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গিয়েছিল তনিমার। তা ছাড়া হয়ত একটু মজা করতেও ইচ্ছে হল তার। লঘু চালে বলল, 'আমার যিনি অপোনেন্ট তাঁর বয়স সত্তর বাহাত্তর। তাঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই সিক্সটি প্লাস হবেন। একজন বৃদ্ধার বাড়ির ভেতর ঢোকা আর বাংলা ছবির ইয়ং সুপারস্টারের ঢোকা কি এক হল? আমার গ্ল্যামারটা ওই ওল্ড লেডি কোথায় পাবেন?'

অনির্বাণ উত্তর দিল না।

ঠিক হল, নির্বাচন কেন্দ্রের দশ-বারোটা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে রোজ প্রচার চালাবে তনিমা। আরম্ভটা কিভাবে হবে তনিমা কতটা কী করে উঠতে পারে, কাজে নেমে গোলমাল করে ফেলে কিনা, এ-সব তদারক করার জন্য সুবিমল, পার্টির কয়েকজন নেতা, অনির্বাণ এবং দীপেশ সঙ্গে যাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে দলীয় কর্মীরা তো থাকবেই। তা ছাড়া থাকবে সর্বক্ষণের সঙ্গী দেবনাথ।

বারো

আগে থেকেই অটোতে অটোতে ঘুরে দলের কর্মীরা মাইকে জানিয়ে দিয়েছিল, আজ তনিমা কোন কোন রাস্তার প্রচারে যাবে। সেই অনুযায়ী তারা বেরিয়েও পড়ে।

একটা বড় ছাদহীন ভ্যানের মাঝখানে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তনিমা। নিচে বসে আছেন সুবিমল দেবনাথ এবং অন্য নেতারা। ভ্যানের সামনের দিকে দলে দলে পার্টি ওয়ার্কার। তাদের হাতে পতাকা। প্রবল উদ্দীপনায় তনিমার নামে তারা অবিরল স্লোগান দিয়ে চলেছে।

প্রথম যে-রাস্তাটিতে ভ্যান ঢুকল সেটি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফিট চওড়া। দু'ধারে সেকেলে সব বাড়ি। মাঝে মাঝে দু-চারটে ঝকঝকে নতুন। সব গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলা সিনেমার মহানায়িকা আসছে। সে-জন্য সকাল থেকে পাড়ায় প্রবল উত্তেজনা। এলাকার বেশির ভাগ বাসিন্দাই রাস্তায় জটলা করছে। রাস্তার দিকের বারান্দাগুলোতে মেয়েদের ভিড়। তাদ্দের চোখেমুখে অনন্ত কৌতূহল।

তনিমাকে দেখে তুমুল হইচই শুরু হয়ে যায়। সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলছে। ফলে এমন প্রচণ্ড শব্দপুঞ্জের সৃষ্টি হচ্ছে যার একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে

না। জনতা ভ্যানের কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে। সেই কারণেই চলছে হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি, গালাগাল। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা।

ভ্যান থামিয়ে দিতে হয়েছিল। সুবিমল মাইকে সকলকে বার বার শান্ত থাকার অনুরোধ করছেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথা কানেও তুলছে না। সুবিমল এবং অন্য জননেতারা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় প্রচার চালানো আদৌ সম্ভব নয়।

তনিমার কিন্তু ভালোই লাগছিল। কিছুদিন ধরেই সে টের পাচ্ছিল তার ফিল্ম কেরিয়ারের সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলতে শুরু করেছে। কিন্তু অসংখ্য মানুষের মাঝখানে এসে দেখতে পাচ্ছে, এখনও তার কী বিপুল জনপ্রিয়তা। হঠাৎ কিছু একটা প্রতিক্রিয়া হয়ে যায় তার মধ্যে। ভাবে পার্টির নেতার কথা না শুনলেও তার কথা জনতা নিশ্চয়ই শুনবে। সুবিমলের হাত থেকে মাইক নিয়ে সে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেখুন, একজন শিল্পী হিসেবে আপনারাই আমার সব। আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া ষোল-সতেরো বছর আমার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হত না। এত কাল আপনাদের কাছে এসে সামনাসামনি কথা বলার সুযোগ হয়নি। আজ ইলেকশনের জন্যে এখানে আসতে পেরেছি। ইচ্ছা ছিল, আপনাদের কথা শুনব, আমারও কিছু বলার আছে। কিন্তু এত গোলমাল হলে কিছুই হবে না। আমাকে বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হবে।'

তনিমার কথাগুলো ম্যাজিকের মতো কাজ করল। বিশাল জনতা লহমায় চুপ করে যায়। তনিমা একটু সময় নিয়ে সামনের মানুষগুলোকে লক্ষ করে। তারপর বলে, 'আপনারা এর ভেতর নিশ্চয়ই জেনে গেছেন, এবারকার নির্বাচনে আমি একজন প্রার্থী। প্রশ্ন করতে পারেন, ফিল্ম ছেড়ে কেন রাজনীতিতে এলাম? তার উত্তরে বলি, আমার টাকার দরকার নেই। ক্ষমতার লোভ নেই। চাই অন্যভাবে আপনাদের একটু সেবা করতে। এখন যিনি এম. পি রয়েছেন তিনি এই অঞ্চলের জন্য কী করেছেন, সে-প্রসঙ্গে যেতে চাই না। সেটা আপনারা আমার চেয়ে অনেক ভালো জানেন। আমি সাধ্যমতো কিছু করতে চাই। মানুষের তো কত রকমের সাধ থাকে। আমারও একটা গোপন সাধ ছিল। মানুষের সেবা করব। কিন্তু করব বললেই তো করা যায় না। তার জন্যে সুযোগ চাই। সেই সুযোগটাই এতদিনে আমার হাতে এসে গেছে। যদি কিছু করতে না পারি, আমার ব্যাগে রেজিগনেশন লেটার সবসময় থাকবে। আপনারা বলামাত্র ইস্তফা দেব।' একটু থেমে ফের বলে, 'কিন্তু নির্বাচনে জিততে না পারলে যা চাই, করা যাবে না। আপনারা দয়া করে আমাকে ভোট দিলে তবেই সেটা সম্ভব—'

ভিড়ের ভেতর থেকে কলরোল শোনা যায়, 'আপনাকে ভোট দেব, আপনাকে ভোট দেব—'

এবার বিরাট দুঃসাহসের কাজটা করে বসে তনিমা। ভ্যান থেকে নিচে নেমে পড়ে সে।

দেবনাথ আঁতকে ওঠে, 'এ কী করছ তুমি! এই ক্রাউডের মধ্যে কেউ নামে!' বলতে বলতে সেও নেমে আসে।

এদিকে সুবিমলরা আতঙ্কগ্রস্তের মতো চিৎকার করতে থাকেন। সিনেমার নায়িকাদের দেখলে মানুষের মাথায় হিস্টিরিয়া ভর করে। হাতের কাছে পেলে তারা যে কী করে বসবে তার ঠিক নেই। অগত্যা সুবিমলদের পক্ষে ভ্যানের ওপর বসে থাকা সম্ভব হয় না।

দেবনাথদের কথা যেন কানেই ঢোকে না তনিমার। সে ভিড়টাকে লক্ষ করে বলে, 'ভাইরা, আমাকে একটু জায়গা করে দিন—'

জনতা সসম্ভ্রমে সরে সরে পথ করে দেয়। সামনের পুরনো, ইট বার-হওয়া একটা তেতলা বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তনিমা চারপাশে নানা মানুষের গলা শুনতে পায়। 'দিদি, আপনার 'প্রাণের পুরুষ' ছবিটা আমি চারবার দেখেছি', কেউ বলে, "মন যারে চায়' ছবিটায় যা কমিক অ্যাক্টিং করেছেন, হাসতে হাসতে পেট বার্স্ট করে যাচ্ছিল।' ইত্যাদি।

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছি বলে কী ভালো যে লাগল—' বলতে বলতে পা ফেলতে থাকে তনিমা।

ফুটপাথের ধার ঘেঁষে আদ্যিকালের বাড়িটা। সদর দরজার সামনে নানা বয়সের মহিলা গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে দু-চারটে কিশোরী এবং যুবতী। ওদের কাছে গিয়ে তনিমা বলে, 'চলুন, আপনাদের সঙ্গে একটু গল্প-টল্প করি—'

মহিলাদের দঙ্গলটা বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে। বাংলা সিনেমার এক মহানায়িকা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন অবিশ্বাস্য। অলীক স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে।

মিষ্টি করে হেসে তনিমা বলে, 'কী হল, ভেতরে চলুন—'

লহমায় হতভম্ব ভাবটা কেটে যায়। মহিলারা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। 'আসুন, আসুন—'

সুবিমল দেবনাথরাও তনিমার সঙ্গে বাড়িটায় ঢুকতে যাচ্ছিল, তনিমাই তাদের থামিয়ে দেয়, বাইরে অপেক্ষা করতে বলে।

ভেতরে পা দিয়েই টের পাওয়া যায়, এটা ভাড়াটে বাড়ি। প্রচুর লোকজন থাকে। নিচে মস্ত চাতাল ঘিরে চারপাশে বারান্দা। বারান্দা ঘেঁষে সারি সারি ঘর। দোতলা এবং তেতলাতেও তা-ই।

বারান্দার এধারে ওধারে অনেকগুলো বঁটি এবং প্রচুর আনাজ। কিছু কাটা হয়েছে, কিছু পড়ে আছে। বোঝা যায়, কুটনো কাটা স্থগিত রেখে মেয়েরা তনিমাকে দেখতে সদরে ছুটেছিল।

তনিমা সামান্য বিব্রত হল, 'আপনাদের রান্নাবান্না হয়নি। খুব অসময়ে এসে পড়েছি—'

মহিলারা কলকল করে ওঠে। মোটেও এটা অসময় নয়। আজ ছুটির দিন। খুব একটা তাড়াও নেই। রান্না-টান্না এক-আধ ঘণ্টা পরে বসালেও চলবে। কিন্তু তনিমা তাদের কাছে এসেছে, তাদের সঙ্গে গল্প করছে—এটা বিরাট সৌভাগ্য। তারপর কে তার কোন কোন ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছে, এক নিঃশ্বাসে তার লম্বা ফিরিস্তি দিতে থাকে।

মহিলাদের বেশির ভাগেরই কাঁখে একটা করে বাচ্চা। ভক্তদের অঢেল প্রশংসা শুনতে শুনতে তনিমা বাচ্চাগুলোকে একের পর এক টেনে নিয়ে আদর করে।

একটি যুবতী বলে, 'দিদি, 'আজকের নায়িকা' বলে সিনেমাটায় আপনি যেরকম ব্লাউজ পরেছিলেন, আমি ঠিক সেই ডিজাইনের ব্লাউজ বানিয়েছি—'

মেয়েটির গালে আলতো টোকা দিয়ে তনিমা বলে, 'তাই বুঝি—'

আজ কে কী রান্না করছে, ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে করতে হঠাৎ তনিমার চোখে পড়ে, একটা মোচা আধাআধি কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। সে চট করে বাকিটা কাটতে বসে যায়। কিন্তু আগে কোনওদিন কি মোচা কেটেছে? ফলে টুকরোগুলো সমান মাপের না হয়ে কিছুটা বড় কিছুটা ছোট হচ্ছে। তার আনাড়িপনায় মেয়েরা হেসে কুটিপাটি।

একজন বয়স্ক গিন্নিবান্নি মহিলা বলল, 'ওভাবে নয় মা, এইভাবে কাটতে হয়—' বলে প্রক্রিয়াটা দেখিয়ে দেয়।

অতি মূল্যাবন, অতি দুর্লভ কোনও জ্ঞান সঞ্চয় করা গেছে, এমন ভাব করে তনিমা বলে, 'যাক, একটা দারুণ ব্যাপার শেখা গেল। আমি ভালো রাঁধতে পারি না। মাঝে মাঝে এসে আপনাদের কাছে রান্না শিখে যাব।'

মহিলারা উৎসাহে টগবগ করতে থাকে। 'এ তো আমাদের ভাগ্য। কবে আসবেন বলুন—'

'সে আপনাদের জানিয়ে দেব—' তারপর আরও কিছুক্ষণ গল্প করে বলে, 'বোনেরা, মায়েরা, এবার আমি এখান থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছি। আপনারা আমাকে একটু দেখবেন—'

বিগলিত ভক্তের দল জানায়, তনিমা কষ্ট করে তাদের বাড়ি এসেছে। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

মধুর হেসে বিদায় নিয়ে পাশের বাড়ি চলে যায় তনিমা। তারপর বাড়ির পর বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির অন্দরমহল সে টার্গেট করেছে। যেখানেই যায়, লহমায় মেয়েদের আপন করে নেয়। চিরুনি দিয়ে কোনও কিশোরীর চুল ঠিক করে, কারও রান্নাঘরে গিয়ে হাতা দিয়ে ফুটন্ত মাছের ঝোল নাড়াচাড়া করে। এমন প্রার্থী আগে কখনও দেখেনি এখানকার মহিলারা। তারা অভিভূত। তনিমা বুঝতে পারে, তার অভিযান শতকরা একশো ভাগেরও বেশি সফল।

এক বাড়িতে ঢুকে সামান্য ধাক্কা খেল তনিমা। একজন মাঝবয়সি ভারী চেহারার মহিলা বললেন, 'তোমাকে তুমি করে বলছি কিন্তু—'

তনিমা হেসে হেসে বলে, 'তাই তো বলবেন—'

'তুমি 'ঘরের লক্ষ্মী' বলে একটা বইতে অ্যাক্টো করেছিলে না?'

তনিমার মনে পড়ে গেল। 'হ্যাঁ—'

'বইটায় তুমি সংসারের বড় বউ হয়েছিলে—'

'হ্যাঁ।'

'ওটায় শ্বশুর শয্যাশায়ী, শাশুড়ির মাথা খারাপ, এক দেওর বেকার, আরেক দেওর স্বার্থপর, সে আলাদা হয়ে যেতে চাইছে। এক ননদকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে এসে উঠেছে তোমাদের কাছে। সংসার ভেঙে যাবার অবস্থা। সারাক্ষণ অশান্তি, ঝগড়াঝাঁটি। বড় বউ হিসেবে সমস্ত সামলে তুমি ফের শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলে। বাড়ির সকলের মুখে শেষ অব্দি হাসি ফুটেছিল। তাই না?'

'হ্যাঁ। ছবিটা আপনার ভাল লেগেছে?'

'ভাল কী বলছ! ভগবানকে বলেছি, প্রত্যেকটা শ্বশুর-শাশুড়ি যেন এরকম বউ পায়। বড্ড ইচ্ছে ছিল, তোমাকে একবার সামনাসামনি দেখি। সেই ইচ্ছেটা অ্যাদ্দিনে পূর্ণ হল। তোমায় কী বলে যে আশীর্বাদ করব মা!' একনাগাড়ে কথাগুলো বলার পর মধ্যবয়সিনী একটু থেমে ফের শুরু করে, 'কিন্তু তোমার অন্য একটা বই দেখে বড্ড কষ্ট হয়েছে। লজ্জায় যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল। ছিঃ ছিঃ—'

অঢেল স্তুতির পর আচমকা পুরোপুরি একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে মহিলার এমন তীব্র নিন্দাবর্ষণে ভীষণ ঘাবড়ে যায় তনিমা। ঢোক গিলে মিনমিনে সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কোন ছবিটা বলুন তো মাসিমা?'

প্রৌঢ়া ধমকের সুরে বল, 'কোনটা জানো না! নিজে করেছ, আর খেয়াল নেই?'

তনিমা ফিস ফিস করে বলে, 'অনেক ছবি তো করেছি। সব কি মনে থাকে?'

প্রৌঢ়া বলে, 'ওই যে হাফ পেন্টুল আর খাটো জামা পরেছিলে, যেটার আবার হাতা নেই। তারপর কোমর আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে কি নেত্য! দেখতে দেখতে গা ঘিনঘিন করছিল। এই কি বাঙালির ঘরের মেয়ে! এমন বই আর কক্ষনো কোরো না বাপু।'

তনিমার মনে পড়ে গিয়েছিল, ছবিটার নাম ছিল 'যুগের হাওয়া।' একটা আলট্রা মডার্ন আমেরিকা ফেরত মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সে। নর্থ-ক্যালকাটার আধা-শিক্ষিত, মাথায় হাজারটা পুরনো ধ্যানধারণায় ঠাসা, এই আধবুড়ি মহিলাটি যে 'যুগের হাওয়া' দেখে বসে আছে, কে জানত! তনিমা তৎক্ষণাৎ মাথা কাত করে জানায়, এই নাক মুলছে, এই কান মুলছে, জীবনে আর কদাপি ওই ধরনের রোল করবে না।

মহিলা তার কাঁধে একটা হাত রেখে নরম গলায় বলে, 'মানুষ খারাপ জিনিসটা চট করে শিখে নেয়। তোমাকে ছবিতে ওইরকম দেখলে মেয়েরা বিগড়ে যাবে। এমন কিছু করা উচিত না যাতে সংসারের ক্ষতি হয়। বুঝলে?'

তনিমা সায় দিয়ে জানাল—বুঝেছে।

প্রৌঢ়া এবার বলে, 'ওই যে বড় বউর অ্যাক্টোটা করেছিলে, ঠিক ওই রকমটা করবে। বাজে মেয়ের পাট একদম নেবে না।'

এই প্রৌঢ়া একজন ভোটার। তাকে কোনওভাবেই চটানো যায় না। সে রেগে গেলে নিজের ভোটটা তো দেবেই না, তার চেনাজানা অন্য মেয়েরা যাতে তাকে ভোট না দেয় তার সুচারু বন্দোবস্ত করে ফেলবে। কাজেই সুশীলা বালিকার মতো মাথা হেলিয়ে দেয় তনিমা। শর্টস-পরা মেয়ের রোলে নেমে ভদ্রঘরের মেয়েদের অধঃপাতের রাস্তা সে কোনওভাবেই দেখাবে না।

প্রৌঢ়া ভীষণ খুশি, 'আমার মাথায় যত চুল ততদিন পরমায়ু হোক। সতীলক্ষ্মী হয়ে স্বামী-পুত্তুর নিয়ে ঘর-সংসার করো। আবার ভোটে জিতে দেশের কাজও করো।'

প্রচার চলছেই। গোড়ার দিকে দু-তিন দিন পর পর দলীয় কর্মী, নেতা এবং দেবনাথকে নিয়ে তনিমা নির্বাচনী কেন্দ্রে যেত। এখন রোজই যাচ্ছে। লক্ষ করে, ওখানকার রাস্তার মোড়ে মোড়ে তার বিরাট কাট-আউট। পোস্টারে আর দেওয়াল লিখনে চারপাশ ছয়লাপ।

শুধু মেয়েদেরই টার্গেট করেনি তনিমা। পুরুষ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে, নানারকম মজা করে তাদেরও মাতিয়ে দিয়েছে। জানিয়েছে, ইলেকশনে জেতার পর নির্বাচন কেন্দ্রের লোকজনকে নিয়ে বেশ কয়েকদিন বসবে। সকলের পরামর্শ নিয়ে আন্তরিকভাবে এলাকার উন্নয়নের চেষ্টা করবে। মেয়েদের মতো পুরুষ ভোটাররাও বেজায় খুশি।

তেরো

একদিন বিকেলের দিকে নির্বাচন কেন্দ্রের একটা পাড়ার প্রচার চলছিল পূর্ণোদ্যমে।

অন্য সব দিনের মতো খোলা ভ্যানে আজও এসেছিল তনিমা। বাংলা ফিল্মের এক মহানায়িকার আসার খবর পেয়ে অজস্র মানুষ ভিড় জমিয়েছে। চারপাশ থেকে আরও অনেকে ছুটে আসছে।

প্রথম দিকে ভিড়টিড় দেখলে কিছুটা ঘাবড়ে যেত তনিমা। কিন্তু ক্রমশ সাহস বেড়ে গেছে। বেড়েছে আত্মবিশ্বাসও। সে জানে মানুষকে মুগ্ধ করার, বশ করার ক্ষমতা তার আছে। সেটাই এখন নিপুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে।

আজও ভ্যান থেকে নেমে পড়েছিল তনিমা। অগুনতি মানুষ তাকে ছেঁকে ধরেছে। তাদের কত যে দাবি, কত রকমের ক্ষোভ!

'দিদি আমাদের রাস্তায় কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার আসে না। নোংরা জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে। দুর্গন্ধে টেকা দায়। দয়া করে কিছু একটা করুন।'

'দিদি এই এলাকায় মশার উৎপাত ভীষণ বেড়ে গেছে। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া হচ্ছে। কর্পোরশেনকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। তারা শুনছেই না। আপনি আমাদের বাঁচান।'

'দিদি, শ্বশুরবাড়িতে আমার ওপর ভীষণ অত্যাচার করে। উঠতে বসতে মারধর। খালি বলে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আয়। বাবা গরিব লোক। কোত্থেকে ওদের খাঁই মেটাবে? শ্বশুরবাড়িতে থাকলে আমাকে মেরেই ফেলত। বাপের বাড়ি এসেও রেহাই নেই। দু-চার দিনি পর পরই শাসিয়ে যাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ির লোকদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'

'দিদি, আমার ছেলেটার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।'

'মা জননী, আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না। কোথায় টাকা পাব, বুঝতে পারছি না। আপনি করুণা করলে অসহায় বাপের মেয়েটার গতি হয়।'

তনিমা বলতে পারত, যে সমস্যাগুলোর কথা সে শুনল, একজন সংসদের নির্বাচন প্রার্থীর সে-সম্বন্ধে কিছু করণীয় নেই। ওগুলো হয় কারও ব্যক্তিগত সমস্যা, নইলে পুরসভার দেখার কথা। কিন্তু মুখের ওপর কাউকেই 'না' বলল না সে। অভয়দানের ভঙ্গিতে হাত তুলে প্রত্যেককে জানালো, নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে তাদের দুঃখ কষ্ট অভিযোগের প্রতিকার করে দেবে।

সবাই ভীষণ খুশি। আগে আর কোনও প্রার্থীকে ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনতে দেখা যায় নি। সকলেরই হয়ত ধারণা হয়, মহানায়িকা ফাঁপা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না। নিশ্চয়ই এবার তাদের পুঞ্জীভূত সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে।

জনতার ভেতর থেকে একজনের গলা শোনা গেল 'ম্যাডাম, আমার একটা প্রবলেম আছে—'

পরিচিত কণ্ঠস্বর। একটু লক্ষ করতেই সন্দীপকে দেখতে পেল তনিমা। রীতিমতো অবাকই হয়ে গেল সে। কালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচনের আগে আগে সন্দীপ চলে আসবে, সেটা জানা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে এসে গেছে, তা ভাবা যায় নি। আসার পর তা সঙ্গে যোগাযোগও করেনি। এখন জনতার ভেতর মিশে গিয়ে দর্শন দিয়েছে। নিশ্চয়ই কোনও মজা করার তালে আছে।

তনিমা কিছু জিজ্ঞেস করার আগে হাতজোড় করে সন্দীপ ফের বলে ওঠে, 'ম্যাডাম, আমি বিদেশে থাকি। কিন্তু মন পড়ে আছে কলকাতায়। একটা স্যুটেবল চাকরি না পেলে আসতে পারছি না। আমি জানি, আপনি করুণা করলে দেশের ছেলের পক্ষে দেশে ফেরা সম্ভব।'

উত্তর না দিয়ে হাতছানি দিয়ে সন্দীপকে ডাকে তনিমা। সে কাছে এলে খুব নিচু গলায় বলল, 'ইয়ার্কি না দিয়ে ভ্যানে গিয়ে বোসো। ওখানে দেবনাথ আছে। আমি কাজটা সেরে আসছি।'

ঠোঁট টিপে, চোখ কুঁচকে একটু হেসে ভ্যানের কাছে চলে যায় সন্দীপ। তারপর পার্টির মাঝারি মাপের দু'জন নেতা এবং কর্মীদের নিয়ে ঘন্টা তিনেক প্রচার চালিয়ে ভ্যানে ফিরে আসে তনিমা। সন্দীপ তখন দেবনাথের পাশে বসে অবাক বিস্ময়ে তাকে লক্ষ করছিল।

তনিমা সন্দীপদের কাছে গিয়ে বসে পড়তে পড়তে জিজ্ঞেস করে, 'কলকাতায় কবে এলো?'

সন্দীপা বলে, ' দিন তিনেক আগে।'

'আমাকে জানাও নি তো।'

'একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমিই তোমার ক্যামপেন দেখে হাঁ হয়ে গেছি।'

এদিকে ভ্যান চলতে শুরু করেছিল। সন্দীপের শেষ কথাটা বুঝতে না পেরে তনিমা ভুরু সামান্য কুঁচকে বলে, 'মানে?'

সন্দীপ বুঝিয়ে দেয়, যেভাবে জনতার সঙ্গে হাসিমুখে, এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে তনিমা তাদের প্রতিটি কথার উত্তর দিচ্ছিল তা দেখে সে মুগ্ধ। ঝানু

রাজনৈতিক নেতারা, যারা বছরের পর বছর ভোটের ময়দান চষে বেড়াচ্ছে তারাও এমনটা পারে না। সে বলল, 'ইউ আর ফ্যান্টাসটিক—'

উত্তর না দিয়ে এবার হাসতে থাকে তনিমা।

সন্দীপ বলে, 'জন-সংযোগটা চমৎকার শিখে গেছ দেখছি—'

'না শিখলে লোকে কি এমনি এমনি আমাকে ভোট দেবে?'

'একেবারে ভেলকি দেখিয়ে ছাড়ছ।'

'বলছ?'

'একশো বার। তুমি হলে মহানায়িকা। দুর্ধর্ষ অভিনেত্রী। ইলেকশন ক্যামপেনের সঙ্গে অ্যাক্টিংটাকে দারুণ মিলিয়ে দিয়েছ। তোমাকে নিয়ে ভোটারদের যেরকম উৎসাহ দেখছি, বাকি ক্যান্ডিডেটদের জামানত না ফরফিটেড হয়ে যায়।'

'প্লিজ, অত বাড়িয়ে বোলো না।'

এরপর আরও কয়েকদিন প্রচারের সময় তনিমার সঙ্গী হল সন্দীপ।

চোদ্দ

আজ নির্বাচন কেন্দ্রের রেডলাইট এলাকায় প্রচারে এল তনিমা। সঙ্গে দেবনাথ এবং দলের মাঝারি ধরনের দু-একজন নেতা ছাড়া অন্য কেউ নেই। সন্দীপের বাড়িতে কী একটা কাজ থাকায় আসেনি। তবে দলীয় কর্মীরা অবশ্য রয়েছে।

কোথাও যাবার দু-চারদিন আগে থেকে পার্টির ছেলেরা সাইকেল রিকশা কি অটোয় চড়ে মাইকে বার বার জানান দিয়ে যায়, অমুক তারিখে বেলা অতটায় নির্বাচনপ্রার্থী তনিমাদেবী আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। এই অঞ্চলেও কয়েক দিন আগে থেকেই অনবরত ঘুরে ঘুরে ছেলেরা তাই করেছিল।

এখানে চওড়া রাস্তা নেই বললেই চলে। গলির পর গলি পাক খেয়ে খেয়ে কোথায় কতদূরে যে ঢুকে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সেগুলোর দু'ধারে আদ্যিকালের সব বাড়ি। একতলা, দোতলা, তেতলা। বেশির ভাগই নোনাধরা, ভাঙাচোরা। তার ভেতর কোনওটা সারিয়ে সুরিয়ে নতুন রং লাগানো হয়েছে। এই পরিবেশে সেটাকে ভারি বেখাপ্পা দেখায়।

এ-পাড়ায় সূর্যালোক প্রায় ঢোকেই না। দিনের বেলাতেও আবছা অন্ধকার। এখানে ওখানে আবর্জনা ডাঁই হয়ে আছে। বাতাসে ভাসছে দুর্গন্ধ।

মেয়েরা অপার কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তনিমার গাড়িটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গর্ত থেকে পাল পাল ইঁদুর বেরুবার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এসে

তনিমাকে ছেঁকে ধরে। স্বপ্নের পরিকে হাতের কাছে পেয়ে মেয়েগুলো কী করবে, ভেবে পায় না। কেউ তাকে ছুঁতে চায়, কেউ ভিড় ঠেলে তার কাছে এসে কিছু জানাতে চায়।

অর্থাৎ অন্য পাড়ায় তাকে দেখে যেমনটা হয়েছে, এখানেও আলাদা কিছু নয়। উন্মত্তের মতো চিৎকারে কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে তনিমা। হাসিমুখে মেয়েদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন ওরা তার কতদিনের চেনা।

মেয়েদের দাবি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বললেই হবে না, তাদের ঘরেও যেতে হবে।

ভোট বড় বিষম দায়। কিন্তু সবার ঘরে যাওয়া তো সম্ভব নয়। প্রতিটি বাড়িতে সারি সারি অগুনতি কামরা। কোনওটা দেবদেবীর ছবি বা মূর্তিতে বোঝাই, কোনওটা ফিল্মস্টারদের। বেশ ক'টি মেয়ের ঘরে তনিমার ছবিও দেওয়ালে সাঁটা রয়েছে।

নির্বাচন কেন্দ্রের অন্য এলাকায় যেমন শোনা গেছে, এখানেও হুবহু তা-ই। তার কত ছবি যে এই মেয়েরা দেখেছে তার লেখাজোখা নেই। সবার মুখে শুধুই তার গুণকীর্তন। দিদি যে ঘেন্না না করে তাদের ঘর অব্দি এসেছেন সে-জন্য তারা অভিভূত। তনিমাকে ওরা ছাড়তে চায় না। হাতের কাছে পেয়ে কিছু একটু খাওয়াবার জন্য ঝুলোঝুলি করতে থাকে। কেউ দামি প্লেটে নিয়ে আসে সন্দেশ, কেউ কেক, কেউ নলেন গুড়ের রাজভোগ।

চারপাশে রকমারি মিষ্টির বহর দেখে আঁতকে ওঠে তনিমা। জানায় সে মিষ্টি খায় না।

মেয়েদের মুখগুলো লহমায় কালো হয়ে যায়। যে-উৎসাহে স্বপ্নের নায়িকাকে তারা আপ্যায়ন করতে চেয়েছিল তার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। একটি মেয়ে তো বলেই ফেলে, 'আমরা নরকে কেন্নোর মতো মুখ গুঁজে পড়ে আছি। তাই দিদি আমাদের ছোঁয়া খেতে চাইছে না।'

এখন একটি ভোটারকেও চটানো চলবে না। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে তনিমা। মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে শান্ত করে। বলে, মিষ্টি খাওয়া ডাক্তারের বারণ। তবে বিনা-চিনি চা দিলে নিশ্চয়ই খাবে।

শুধু ওই মেয়েটিই নয়, বাকি সবার মুখও ঝলমল করে ওঠে। নাঃ, বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়িকা তাদের ঘৃণা করেনি। তক্ষুনি চিনি-ছাড়া চা চলে আসে এবং তা হাসি হাসি মুখ করে গিলতেও হয় তনিমাকে।

বাহান্ন পাকের গলিগুলোতে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি, সিঁড়ি ভেঙে একতলা থেকে দোতলা, কোথাও বা তেতলা অব্দি অভিযান চলতে থাকে।

একটা বাড়িতে ঢুকে এক দঙ্গল মেয়ের সঙ্গে তনিমা যখন কথা বলছে, ভিড় ঠেলতে ঠেলতে একজন এগিয়ে আসে। 'তোরা একটু সরে দাঁড়া। দিদির কাছে যেতে দে—'

বছর পঁচিশের এক যুবতী সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখে বসন্তের দু-চারটে দাগ থাকলেও চটকদার চেহারা। আলগা করে শাড়ি পরা। খোলা চুল উড়ছে। চোখে বাসি কাজলের টান।

মেয়েটা ঝপ করে ঝুঁকে তনিমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

প্রণাম-ট্রণাম নেবার অভ্যাস নেই তনিমার। সে পেছন দিকে একটু সরে যায়। বিব্রতভাবে বলে, 'আরে আরে, এ কী করছ!'

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'দিদিকে পেন্নাম করছি। আপনি কোনও দিন এই নরককুণ্ডুতে আসবেন তা কি ভাবতে পেরেছিলাম!' তারপর এ-পাড়ার অন্য বাসিন্দাদের মতো তড়বড় করে তনিমার এক গাদা ছবির নাম করে জানায়, সবগুলোই সে দেখেছে। তনিমার ছবি যেদিন হল-এ রিলিজ করে, প্রথম শো'তে সে দেখবেই দেখবে। কোনও কারণে দেখতে না পেলে মনে হবে, জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল।

উচ্ছ্বাস ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে মেয়েটার মুখ থেকে। এ-সব নতুন কিছু নয়। ফ্যানেদের স্তুতি কতকাল ধরে শুনে আসছে তনিমা। মুখে হাসি ফুটিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেয়েটি বলে, 'আপনার কত বই তো দেখেছি, কিন্তু কোনটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে জানেন?'

উৎসুক সুরে তনিমা জিজ্ঞেস করে, 'কোনটা?'

"এক টুকরো স্বপ্ন।"

তনিমার মনে পড়ল, ছবিটা গত বছর রিলিজ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বক্স অফিসে হিট। গোল্ডেন জুবিলি করেছে। গল্পের পটভূমি রেড লাইট এরিয়া। মূল চরিত্রগুলো ছিল বারবনিতা। গা ঘিনঘিন করা, ঘৃণ্য, কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে থেকেও তাদের একজন সুস্থ জীবনের স্বপ্ন দেখে। তাঁর প্রেমিককে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায় অনেক, অনেক দূরে। সে চায় স্বামী সন্তান নিয়ে একটি সুখের সংসার। সমস্ত বাধা কাটিয়ে কিভাবে তার স্বপ্নপূরণ ঘটে তা-ই নিয়ে কাহিনির বিস্তার।

মেয়েটি থামেনি, 'দিদি, ওই বইটায় আপনাকে দেখতে দেখতে চোখের পাতা ফেলতে পারছিলাম না। কী ভাবছিলাম জানেন?'

'কী?'

'আপনি তো ভদ্দর ঘরের মেয়ে। লেখাপড়া জানেন। কিন্তু আমাদের মতো বেবুশ্যেদের অ্যাক্টোটা করলেন কী করে? অত রং ঢং, কোমর দুলুনি, পুরুষ ড্যামনাগুলোকে চাগিয়ে দেবার জন্যে ঢুলু ঢুলু চাউনি—এসব শিখলেন কোথায়?'

তনিমা এ-জাতীয় প্রশ্নে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করে না। বলে, 'ছবিতে যে-রকম চরিত্র থাকবে তেমন অ্যাক্টিংই তো করতে হবে। ডিরেক্টররা আমাদের সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেন।'

পরিচালকদের ঘাড়ে তালিমের দায়টা চাপিয়ে দিয়েও পুরোপুরি পার পাওয়া গেল না। মেয়েটি বলে, 'যতই শিখোয়ে দিক, নিজের ক্ষ্যামোতা না থাকলে এতসব পারা যায়?'

কী বোঝাতে চায় মেয়েটা? তার মধ্যে একটি নিখুঁত গণিকা হবার মালমশলা মজুত রয়েছে? 'এক টুকরো স্বপ্ন'-র রোলটা পেয়ে সেগুলো বেরিয়ে পড়েছে? তনিমার মুখে ফিকে একটু হাসি ফোটে।

মেয়েটা বলে, 'দিদি, আমাদের লাইনে যদি আসতেন, এ-পাড়ার মেয়েদের আর করে খেতে হত না। উপুস দিয়ে মরতে হত।'

প্রশংসাটা মারাত্মক ধরনের। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে তনিমা। প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলার জন্য বলে, 'আরও অনেকের বাড়ি যেতে হবে। এখন চলি—'

এলাকায় কি দশ-বিশটা বাড়ি? লাইন দিয়ে পরপর দাঁড়িয়ে আছে। সবগুলোতে যাওয়া সম্ভব হল না। আরও কয়েকটা বাড়ি ঘুরে, রাস্তা থেকেই জোড়হাতে তনিমা বলে, 'ভোট এসে গেল। আশা করি, আমার কথাটা মনে রাখবেন—'

গলিঘুঁজি থেকে খানিকটা দূরে বড় রাস্তার কাছাকাছি ছাদহীন, খোলা বড় ভ্যানটা দাঁড় করানো ছিল। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সবে তনিমা সেটায় গিয়ে উঠেছে, গাড়িটাও স্টার্ট দিতে যাবে, আচমকা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল।

খানিক দূরে, ডানাধারের একটা গলি থেকে একটি মেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। শাড়ির আঁচল লুটোচ্ছে তার, বাতাসে উড়ছে চুল।—'বাঁচান দিদি, আমাকে বাঁচান—' মেয়েটার পেছনে তাড়া করে আসছে আট-দশ জনের একটা বাহিনি। তাদের সঙ্গে তিন-চারটে রণচণ্ডীমার্কা বয়স্ক মেয়েমানুষ। গলার শির ছিঁড়ে ওরাও চেঁচাচ্ছিল।

তনিমা হতভম্ব। এটুকু বোঝা যাচ্ছে, রক্ষা করার জন্য তাকেই বেছে নিয়েছে মেয়েটা। কী হতে পারে তার? ধাওয়া করছে যে লোকগুলো তারা কারা?

মেয়েটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। ভ্যানের ওদিকটায়, অর্থাৎ যেধারে রেডলাইট এরিয়া, সেখানে রয়েছে পার্টি কর্মীরা। তাদের ভেদ করে এপারে

আসতে চাইছে সে, কিন্তু ছেলেরা চাপ বেঁধে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যে আসতে পারছে না।

মেয়েটা আতঙ্কগ্রস্তের মতো একবার পেছনের হিংস্র দঙ্গলটার দিকে তাকাচ্ছে, তারপরেই হাতজোড় করে ব্যাকুলভাবে তনিমাকে বলছে, 'ওই ওরা এসে পড়ল দিদি। আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। আপনি না বাঁচালে আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে। দিদি—দিদি, আপনার ছেলেদের বলুন, যেন না আটকায়—'

মেয়েটার চোখেমুখে একসঙ্গে কত কিছু যে খেলে যাচ্ছে! ত্রাস, কাকুতি মিনতি, তীব্র শঙ্কা।

তনিমার বিহ্বলতা কাটেনি। মেয়েটা যে খুবই বিপন্ন, তা আন্দাজ করা যাচ্ছে। কিন্তু বিপদের সঠিক কারণটা কী, এই মুহূর্তে বোঝার উপায় নেই।

আজ সুবিমল রাহা বা কৃষ্ণকিশোর নির্বাচনী প্রচারে তনিমার সঙ্গে আসেননি। এসেছেন জগদীশ মাইতি। তিনিও পার্টির একজন বড় মাপের নেতা। তাছাড়া দেবনাথ তো রয়েছেই। দু'জনে তনিমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা তনিমার কানে মুখ ঠেকিয়ে বলতে থাকে, 'এ-সব উটকো ঝামেলার ভেতর জড়াবার দরকার নেই।' ভ্যানের ড্রাইভার স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে অপেক্ষা করছিল। তাকে বলল, 'স্টার্ট দাও—'

তনিমার মধ্যে কোথাও একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগে যেন। পলকে হতভম্ব ভাবটা কেটে যায়। ড্রাইভারকে থামিয়ে পার্টির কর্মীদের গম্ভীর গলায় বলে, 'মেয়েটাকে আসতে দাও—'

তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা প্রবল ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে ছেলেরা সরে সরে জায়গা করে দেয়।

দেবনাথ এবং জগদীশ ভীষণ বিচলিত। তারা একনাগাড়ে বলে যায়, 'এটা ঠিক হচ্ছে না। মেয়েটার মতলব আমরা জানি না। ওকে সঙ্গে নেবেন না। পরে সবাই ফ্যাসাদে পড়ে যাব।'

তনিমা কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। পলকহীন সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। চেহারায় গেঁয়ো ভাব থাকলেও মেয়েটা আশ্চর্য সুন্দরী। বড় বড় টানা চোখ, পাতলা ফুরফুরে নাক, কোমর অব্দি অজস্র চুল, টকটকে রং।

ভ্যানের সামনে আসতেই হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে তুলে নেয় তনিমা। ড্রাইভারকে হুকুমের সুরে বলে, 'চালিয়ে দাও। সোজা আমাদের বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাবে—'

গাড়ি চলতে শুরু করে। ওদিকে হামাদার বাহিনী উন্মত্তের মতো ধাওয়া করে এসে পড়েছে। রাগে, উত্তেজনায় তারা যেন ফুটছে, 'দিদি, মাগীটাকে নামিয়ে দিন। আমরা ওরে কিনে এনেচি—'

মেয়েটা ভয়ে সিঁটিয়ে তনিমার পেছনে লুকোয়। থরথর কাঁপছিল সে।

যারা তাড়া করে এসেছিল, তাদের কথার উত্তর দেয় না তনিমা। মুখ ফিরিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ির স্পিড তুলতে বলে।

রেড লাইট এরিয়া ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে তনিমারা। ধাওয়া করে আসা সেই পুরুষ আর মেয়েমানুষগুলোর নাগালের বাইরে। বাহিনীটা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। আর মিনিটে শ'খানেক শ'দেড়েক করে বাছা বাছা গালাগাল দিয়ে চলেছে।

জগদীশ শুকনো স্বরে একবার বললেন, 'কাজটা ভালো করলেন না ম্যাডাম—'

এছাড়া কারও মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরুল না।

পনেরো

বাড়ি ফেরার পর ওপরে উঠলেন না জগদীশ। থমথমে মুখে নিচে থেকেই তনিমাদের নামিয়ে ভ্যান নিয়ে চলে গেলেন।

অ্যাপার্টমেন্টে আসার পর মেয়েটা দু'হাতে মুখ ঢেকে অবিরল কেঁদেই চলে। তাকে একটা সোফায় বসিয়ে পাশে বসে থাকে তনিমা। একটু দূরে অন্য একটা সোফায় বসেছে দেবনাথ। একদৃষ্টে সে মেয়েটাকে লক্ষ করতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর কান্নার দমকটা কমে এলে নরম গলায় তনিমা বলে, 'তোমার নাম কী?'

মুখ থেকে ধীরে ধীরে হাত সরায় মেয়েটা। চোখ দু'টো রক্তবর্ণ। একটানা কান্নায় ফুলে গেছে। গাল চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। তবে খানিক আগের আতঙ্কের ভাবটা অনেকখানিই কেটে গেছে। হয়ত তার মনে হচ্ছে, এখানে সে নিরাপদ।

কান্নার রেশ এখনও গলায় জমে আছে তার। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'কমলা—' পরক্ষণে তনিমার দুই পা আঁকড়ে ধরে, 'ওই লোকগুলো ঠিক খুঁজে খুঁজে এখানে এসে হাজির হবে। আপনি ওদের হাতে আমাকে তুলে দেবেন না দিদি—'

কমলাকে তুলে বসিয়ে ধীরে ধীরে তনিমা বলে, 'ওদের হাতেই যদি তুলে দেব, তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম কেন? কোনও ভয় নেই। কোথায় তোমার বাড়ি, কে কে আছে, কীভাবে তুমি ওরকম নোংরা পাড়ায় গিয়ে উঠলে—সব খুলে বল্লো—'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে কমলা। তারপর এলোমেলো ভাবে যা বলে যায় তা মোটামুটি এইরকম।

মা বাবা ভাই বোন, কেউ নেই তার। বর্ধমান জেলার ছোটখাটো একটা শহরে দূর সম্পর্কের এক মামার কাছে থাকত। মামা মামি, দু'জনেই খুব খারাপ মানুষ। লোভী, বদমাশ। দিনকয়েক হল তারা তাকে হরেন মণ্ডল নামে একটা লোকের কাছে বেচে দেয়। তনিমা যেখানে ভোটের প্রচারে গিয়েছিল, হরেন তাকে সেই রেড লাইট এলাকায় এক বাড়িউলির কাছে এনে তোলে। ওখানে আসার পর শুরু হয়েছিল কমলার কান্না। এক ফোঁটা জলও তাকে কেউ খাওয়াতে পারেনি। দু দু'টো দিন সে উপোস দিয়ে আছে।

বাড়িউলি আদৌ জোরজুলুম করেনি। কমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অন্য মেয়েদের বলত, 'পেত্থম পেত্থম এমন কান্নাকাটি করবে। পালাবার জন্যি ডানা ঝাপটাবে। তারপর ঠিক বশ মেনে নাইনে (লাইনে) এসে যাবে।

শেষ পর্যন্ত কী হত বলা যায় না। তনিমা আজ আচমকা ভোটের জন্য সেখানে গিয়ে হাজির। বাংলা ছবির মহানায়িকা এসেছে। সবাই তাকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব। কমলার দিকে কারও তেমন নজর ছিল না। এই সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে সে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে তনিমার কাছে চলে এসেছিল।

সমস্ত শোনার পর বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল তনিমার। গভীর গলায় বলল, 'বুঝেছি। দু'দিন পেটে কিছু পড়েনি। চান করে, খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

কমলাকে দু'টো শাড়ি দিল তনিমা। তার স্নান হয়ে গেলে কাছে বসে খাইয়ে একটা ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দিল। বলল, 'ভালো করে ঘুমোও—'

লিভিং রুমে বসে নিঃশব্দে লক্ষ করছিল দেবনাথ। সেখানে ফিরে আসে তনিমা।

দেবনাথ জিজ্ঞেস করে, 'মেয়েটাকে তো ব্রথেল থেকে নিয়ে এলে। ওকে নিয়ে কী করতে চাও?'

তনিমা বলল, 'ওকে ব্রথেলে অন্তত ফেরত পাঠাব না। আপাতত ও আমাদের কাছেই থাক। পরে ভেবে-চিন্তে ঠিক করব—কী করা যায়।'

দেবনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'মেয়েটা খুব সুন্দর। বিউটিফুল—' শেষ শব্দটার ওপর যথেষ্ট জোর দিল সে।

তনিমা চমকে ওঠে, 'আগলি হোক আর বিউটিফুল হোক, ওকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

দেবনাথ নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে নেয়, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে—'

কমলা যখন মেয়েপাড়ায় দিশেহারা হয়ে ছুটে এসেছিল, অন্য কোনও দিকে

লক্ষ ছিল না তনিমার। ঘটনাটা যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবনীয়। কিন্তু এখন একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে দেবনাথ। তার দশ-বারো বছরের সঙ্গী। লোকটাকে হাড়ে হাড়ে চেনে তনিমা। বয়স পঞ্চাশ হলেও সারাক্ষণ শরীর জুড়ে ওর খালি খাই খাই। যুবতী মেয়ে দেখলে মাথার ঠিক থাকে না, ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

তনিমা সতর্ক করে দেবার সুরে বলল, 'মনে রেখো, কমলাকে কিন্তু আমি শেলটার দিয়েছি।'

দেবনাথ ঘাড় কাত করে, 'সে তো বটেই।'

রাত্তিরে সুবিমল রাহা আর কৃষ্ণকিশোর তরফদার চলে এলেন। দু'জনেই ভীষণ উদ্বিগ্ন।

সুবিমল বললেন, 'আমি একটা দরকারে আসানসোলে গিয়েছিলাম। ওখানেই ফোনে পরিমল আমাকে খবর দিল, আপনি ক্যামপেনে গিয়ে রেড লাইট এরিয়া থেকে একটা মেয়েকে রেসকিউ করে নিয়ে এসেছেন।'

তনিমা বলল, 'ঠিকই শুনেছেন। মেয়েটার আত্মীয় তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। সে ওখানে থাকতে চায় না। ভদ্রভাবে বাঁচতে চায়। আমাকে এমনভাবে ধরল যে না এনে পারিনি।'

'কাজটা ঠিক করেননি দিদিভাই—'

'একটা মেয়েকে নরক থেকে উদ্ধার করেছি—সেটা ঠিক কাজ নয়?'

সুবিমল বোঝাবার জন্য সাতকাহন ফাঁদেন। রেড লাইট এলাকায় সমাজসেবা বা বিপন্ন কোনও মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য আজ যায়নি তনিমা। তার একমাত্র উদ্দেশ্য নিপুণভাবে প্রচার করে ওই অঞ্চলের ভোটগুলো পাওয়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় মেয়েটাকে নিয়ে আসার ফলে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যে বাড়িউলি ওকে কিনেছে তার নাম মোক্ষদা। সে ডাকসাইটে জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। ওই রেডলাইট ডিস্ট্রিক্টে তার বিরাট প্রভাব। তার কথাই ওখানকার শেষ কথা। তার হুকুম অমান্য করার মতো বুকের পাটা ওই অঞ্চলের কারও নেই।

সুবিমল জানালেন, ওই মেয়েটা অর্থাৎ কমলাকে তনিমা নিয়ে আসার পর মোক্ষদা চার-পাঁচবার তাঁদের পার্টি অফিসে লোক পাঠিয়েছে। তারা কমলাকে আজই ফেরত চায়।

পলকহীন সুবিমলের দিকে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছিল তনিমা। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী চান?'

সুবিমল অস্বস্তি বোধ করেন, 'দেখুন, ওখানে আট-দশ হাজার সলিড ভোট আছে। মোক্ষদা চটে গেলে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে তনিমা বলে, 'ওই ভোটগুলো পাওয়া যাবে না—এই তো?'

সুবিমল চুপ।

তনিমা বলতে থাকে, 'না পাওয়া গেলে আর কী করা যাবে? শেলটার যখন দিয়েছি, কমলাকে আমি ফিরিয়ে দেব না। এতে যদি আপনাদের মনে হয়, আমাকে আপনাদের প্রয়োজন নেই, আমি সরে যেতে রাজি—'

সুবিমল হকচকিয়ে যান, 'আপনার নাম অ্যানাউন্সড হয়ে গেছে। পুরোদমে ক্যামপেন চলছে। এখন আর আপনার পক্ষে সরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে চিন্তাগ্রস্তের মতো বসে থাকেন সুবিমল। তারপর বলেন, 'ঠিক আছে, আপনি রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট ছাড়া কনস্টিটিউয়েন্সির অন্য এলাকাগুলোয় ক্যামপেন করুন। কমলার ব্যাপারটা কীভাবে সামলানো যায়, আমি দেখছি।'

সন্দীপ কীভাবে যেন খবর পেয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে তার ফোন এল। সে দারুণ উত্তেজিত এবং উচ্ছ্বসিতও। বলল, 'একটা দুর্দান্ত কাজ করেছ।'

তনিমা অভিভূত। বলল, 'একমাত্র তুমিই আমার কাজটা সাপোর্ট করলে। মেয়েটাকে যে রেসকিউ করে এনেছি সেটা কেউ ভালো চোখে দেখছে না।'

'কী বলছে তারা?'

'ওকে, মানে কমলাকে যেন বাড়ি থেকে বার করে দিই। ভীষণ প্রেসার দিচ্ছে। রাজি হই নি।'

সন্দীপ বলে, 'ঠিক করেছ। অন্যের চাপের কাছে যদি ভেঙে পড়, মেয়েটার লাইফ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।' একটু থেমে আবার বলে, 'ইলেকশনে তুমি জিতবে কি না জানি না। তবে রাজনীতি করতে এসে যদি একটা মেয়েকেও রক্ষা করতে পার, সেটা বিরাট কাজ। মস্ত সামাজিক দায়িত্ব পালন। তোমার এম.পি কি মন্ত্রী হবার চেয়েও অনেক মহৎ ব্যাপার।'

তনিমা আপ্লুত। বলে, 'তোমার কথায় ভরসা পেলাম। কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব—'

'ধন্যবাদের দরকার নেই। মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে কিছু ভেবেছ?

'না। আপাতত ও আমার থাকুক। আপাতত ইলেকশনটা শেষ হোক। তারপর সবাই মিলে ভেবে চিন্তে কিছু একটা ঠিক করব।'

'হ্যাঁ, সেই ভালো।'

'এ ব্যাপারে তোমার হেল্প পাব তো?'

'নিশ্চয়ই। যে সাহায্য দরকার তাই পাবে।'

ষোল

কমলা অ্যাপার্টমেন্টে থেকে গেল।

এদিকে নির্বাচনী প্রচার চলছে বিপুল উদ্যমে। ইলেকশনের যদিও মাসখানেক দেরি আছে, বিশাল নির্বাচন কেন্দ্রের আধাআধি জায়গাতেও এখন অব্দি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তাই খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, ছুটির দিন নেই, কাজের দিন নেই—সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এক গলি থেকে আরেক গলিতে, এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় ছুটে বেড়াচ্ছে তনিমা। তিরিশ দিনের ভেতর বাকি ভোটারদের কাছে হাতজোড় করে তাকে দাঁড়াতেই হবে।

নির্বাচনী প্রচারের শুরু থেকে পার্টির নেতাদের কেউ না কেউ তনিমার সঙ্গে থাকে। রোজই সুবিমল, কৃষ্ণকিশোর বা জগদীশরা যান না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ নেতারা তাকে সঙ্গ দেন। মাঝে মাঝে পুরনো স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং প্রাক্তন এম. পি মল্লিনাথ দত্ত, বেয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের অগ্নিকন্যা এবং এখনকার বিধানসভার সদস্য মণিমালা ভৌমিক, ব্রিটিশ আমলের আরও ক'জন ফ্রিডম-ফাইটার গুণময় সামন্ত, হেমন্ত ঝুমার লাহিড়িরাও যান। তবে প্রতিদিন একটি লোক থাকবেই। দেবনাথ। সন্দীপের মা হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর একটা অপারেশন হবে। তাই তাঁকে নার্সিং হোমে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। কাজেই রোজ তার পক্ষে আসা সম্ভব হচ্ছে না। সময় পেলে হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ে।

কিন্তু ইদানীং সপ্তাহখানেক দেবনাথকে ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। কোনও দিন তার শরীর খারাপ থাকে, তাই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরুতে পারে না। কোনও দিন প্রচারে বেরিয়ে 'জরুরি কাজ আছে' বলে ভ্যান থেকে নেমে চলে যায়। তনিমাকে সর্বক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, অজস্র মানুষের সঙ্গে কথা বলে এতটাই ব্যস্ত থাকতে হয় যে এ-সব নিয়ে ভাবার সময় থাকে না। অ্যাপার্টমেন্টে যখন ফেরে—পুরোপুরি বিধ্বস্ত, ক্লান্তিতে হাত-পায়ের জোড়গুলো যেন আলগা হয়ে যেতে থাকে। তবু তারই মধ্যে কমলার ভয়ার্ত মুখ চোখে পড়ে। কোনও কারণে সে যেন ত্রস্ত।

শিবু অনেক দিন তনিমাদের বাড়িতে কাজ করছে। অত্যন্ত বিশ্বাসী। মনে হয়, তার মধ্যেও কেমন একটা অস্থির ভাব। শিবু আর কমলা তাকে কিছু যেন জানাতে চায়, কিন্তু সাহস করে উঠতে পারে না। তনিমারও এমন উৎসাহ অবশিষ্ট থাকে না যাতে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়।

সতেরো

সেদিনও প্রচারে বেরিয়েছে তনিমা। সঙ্গে রয়েছেন কৃষ্ণকিশোর এবং দলের আরেকজন নেতা হরিনাথ মল্লিক। দেবনাথ আসেনি। তার পেটের অবস্থা ভালো নয়।

সেই দুপুর থেকে ছোটাছুটি চলছিল তনিমার। এখন দিন ফুরিয়ে আসছে। সূর্য পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর আড়ালে নেমে গেছে। তবে শেষ বেলার ফিকে লালচে আলো এখনও লেগে আছে চারদিকে।

হঠাৎ তনিমার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। কানে সেটা ঠেকাতেই চেনা গলা শোনা যায়। শিবু।

তনিমা রীতিমতো অবাক হল। যদিও নাম্বারটা দেওয়া আছে, শিবু কখনও তাকে মোবাইলে ফোন করে না। কী এমন হতে পারে?

তনিমা জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার শিবু?'

শিবু বলে, 'দিদি, আমার মনে হচ্ছে, খুব বিপদ। সাহেব আমাকে, মধুকে আর পবনকে ফেলাটের (ফ্ল্যাটের) বাইরে বার করে দিয়েচেন। আমি রাস্তার একটা দোকান থিকে ফোন করচি।'

তনিমা চমকে ওঠে। 'বার করে দিয়েছে কেন?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে শিবু বলে, 'ফেলাটে সাহেব আর কমলা আচে। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন, চলে আসুন—'

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। মাথার ভেতর একটা রগ যেন আচমকা ছিঁড়ে যায়। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তনিমা কৃষ্ণকিশোর এবং হরিনাথকে বলে, 'আমাকে এখনই অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে হবে।'

কৃষ্ণকিশোর এবং হরিনাথ, দু'জনেই হতবাক। তনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে তারা কিছু আঁচ করতে চেষ্টা করে। তারপর উদ্বেগের সুরে বলে, 'কী হয়েছে?'

'জানি না। আমার জন্যে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—'

তাদের হাই-রাইজে পৌঁছলে নিচের চত্বরে শিবুদের দেখতে পেল তনিমা। সবার চোখে-মুখে অসীম উদ্বেগ। সে বলে, 'এস আমার সঙ্গে—'

লিফটে ওপরে উঠে আসে সবাই। তনিমার ব্যাগে সবসময় অ্যাপার্টমেন্টের

একটা চাবি থাকে। ইচ্ছা করলে ডোর-বেল বাজাতে পারত। কিন্তু না, অতর্কিতে ঢুকে সে দেখতে চায় ভেতরে কী চলছে।

চাবি ঘুরিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে পা দিতেই চোখে পড়ল, বাঁদিকের বেড-রুমটায় সম্পূর্ণ উদোম দেবনাথ কমলাকে ধাওয়া করছে। কমলার শরীরে শাড়ি বা সায়াটায়া নেই, জামাটাও ছিঁড়ে লতপত করছে। ত্রস্ত, আতঙ্কিত মেয়েটা পাগলের মতো খাটের চারপাশ দিয়ে ছোটাছুটি করছে।

দেবনাথ কেন যে মাঝে মাঝে আজকাল অসুস্থ হয়ে পড়ছে তার কারণটা এখন বোঝা গেল। গলার শিরা ছিঁড়ে চিৎকার করে ওঠে তনিমা, 'স্টপ ইট, স্টপ ইট—'

দু-কান কাটা, নির্লজ্জ দেবনাথ দাঁত বার করে হাসে, 'ছুনুমুনু তুমি! এম. পি হবে, মন্ত্রী হবে—ইলেকশনের ক্যামপেন ফেলে হুট করে ফিরে এলে যে!'

শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে এসেছিল। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত ঘষে তনিমা বলে, 'জানোয়ারের বাচ্চা, তোকে না বলেছিলাম, কমলাকে আমি শেলটার দিয়েছি—'

দু'চোখে আগুন ঝলকে ওঠে দেবনাথের। দাঁতে দাঁত ঘষে ভেংচানোর ভঙ্গিতে সে বলে, 'এক সতীলক্ষ্মী আরেক সতীলক্ষ্মীর ইজ্জত বাঁচাতে এসেছে! কদ্দিন আর শেলটার দেবে ছুনুমুনু! দু'দিন পর তো সেই বেশ্যাপট্টির লাইনে গিয়ে দাঁড়াবে। না হয় দু'দিন আগে—'

মস্তিষ্কে বিস্ফোরণ ঘটে যায় তনিমার। বছরখানেক আগে নেপালে শুটিং করতে গিয়ে একজোড়া কুকরি কিনে এনেছিল সে। সে দু'টো দেওয়ালে আড়াআড়ি সাজিয়ে রেখেছে। আচমকা তার একটা টেনে নিয়ে দেবনাথের দিকে ছুড়ে মারে। সেটার চোখা মুখ তার বুকে ঢুকে যায়। একটা তীক্ষ্ণ, আর্ত চিৎকার। পরক্ষণে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে লুকিয়ে পড়ে দেবনাথ। রক্তে ভেসে যেতে থাকে চারদিক।

এমন একটা মারাত্মক কাণ্ড ঘটবার পরও স্নায়ুমণ্ডলী আশ্চর্য রকম শান্তই আছে তনিমার। বেডরুমের একধারে দু'হাতে বুক ঢেকে থরথর কাঁপছিল কমলা। তাকে বলল, 'নিজের ঘরে গিয়ে একটা শাড়ি পরে এস—'

শিবুরা লিভিং রুমে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মূক এবং বধির। তাদের পাশ দিয়ে অবিচলিত পা ফেলে টেলিফোনের সামনে চলে আসে তনিমা। প্রথমে সন্দীপকে ফোন করল সে, তারপর থানায়।

আধ ঘণ্টার মধ্যে সন্দীপ চলে আসে। কমলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, তার সম্বন্ধে সমস্ত জানিয়ে তনিমা বলল, 'তোমাকে কতটা বিশ্বাস করি, তুমি জানো। ওকে দেখো—'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই পুলিশের একটা দল এসে হাজির।

রক্তাক্ত দেবনাথকে দেখিয়ে পুরো ঘটনাটা জানাবার পর তনিমা দু'হাত বাড়িয়ে পুলিশ অফিসারকে বলে, 'আমাকে হ্যান্ড-কাফ পরাতে পারেন।'

পুলিশ অফিসারটি বললেন, 'তার দরকার নেই। আমাদের সঙ্গে থানায় চলুন—'

পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চকিতে তনিমার মনে হয়, নানা কাহিনিকারের চরিত্রে পরিচালকের নির্দেশমতো অভিনয় করে করে সে মহানায়িকা হয়েছিল। সুবিমল রাহা এবং সেই দুই প্রোফেশনালের তালিম অনুযায়ী চললে এম. পি, হয়ত বা মন্ত্রীও হতে পারত।

কিন্তু কমলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর থেকে যা যা সে করেছে, সবই নিজের ইচ্ছায়, নিজের বিবেচনায়।

কী হতে পারে তার? লম্বা মেয়াদের জন্য জেল, নাকি ফাঁসি? যা-ই হোক, সব কিছুর জন্য তনিমা প্রস্তুত। তার লেশমাত্র আক্ষেপ নেই।